ইউনিট ৪
মৃত্তিকার জৈবিক বৈশিষ্ট্য

ইউনিট ৪ মৃত্তিকার জৈবিক বৈশিষ্ট্য

সাধারণত মৃত্তিকায় জৈব পদার্থ শতকরা ৫ ভাগের কম থাকে। কিন্তু গুরুত্বের ভিত্তিতে একে মাটির প্রাণ বলা হয়। লক্ষ লক্ষ জীব ও উদ্ভিদ মাটিতে বসবাস করে। এরা সবাই জৈব পদার্থ থেকে তাদের খাদ্য গ্রহণ করে। আবার জৈব পদার্থ অণুজীবের বাসস্থান ও খাদ্য যোগায়। মৃত্তিকায় সুস্থ পরিবেশ রক্ষার জন্য জৈব পদার্থের ভূমিকা অতুলনীয়। মৃত্তিকা আবার জৈবিক বৈচিত্র্যতায় পরিপূর্ণ। এখানে জৈব পদার্থের চারপাশে ভরে রয়েছে বড়জীব ও অণুজীব। মৃত্তিকায় জৈবিক কর্মকান্ড ব্যাহত হলে চাষাবাদ সম্ভব নয়। এ ইউনিটে মৃত্তিকার জৈবিক উপাদান, জৈব পদার্থের গুরুত্ব, মৃত্তিকা জীব, মৃত্তিকা অণুজীব ও মৃত্তিকা অণুজৈবিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৪.১ মৃত্তিকার জৈবিক উপাদান

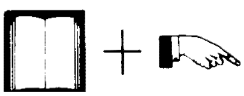

এ পাঠ শেষে আপনি –

- জৈব পদার্থের উপাদান সম হের তালিকা করতে পারবেন।
- হিউমাসের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে পারবেন।
- কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত ঠিক করতে পারবেন।
- হিউমিক এসিড, ফালভিক এসিড, হিউমিন ও এলমিন এবং হেমাটোমেলানিক এসিডসম হের বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।

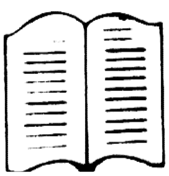

মৃত্তিকা জৈবিক উপাদানসমূহ প্রধানত দু'ধরনের। যথা ঃ বিভিন্ন ধরনের বড় ও ক্ষুদ্র জীব এবং প্রাণহীন বিভিন্ন জৈব অবশেষ যা জৈব পদার্থ, হিউমাস ইত্যাদি নামে পরিচিত। জৈব পদার্থ ও হিউমাস বিভিন্ন জীবের দেহ বা দেহাংশের পচনশীল অবশেষ।

জৈব পদার্থের উপাদান বা গঠন

জৈব পদার্থ নিম্নলিখিত উপাদান সমূহ বিভিন্ন অনুপাতে ধারণ করে –

(১)	কার্বহাইড্রেট	(২)	প্রোটিন
(৩)	এমাইনো এসিড	(৪)	ফ্যাট বা চর্বি
(৫)	তৈল	(৬)	মোম
(৭)	রেজিন	(৮)	এলকোহল
(৯)	এলডিহাইড ও কিটোন	(১০)	জৈব এসিড
(১১)	লিগনিন	(১২)	এলকালয়েড
(১৩)	অক্সিন	(১৪)	ভিটামিন
(১৫)	এনজাইম	(১৬)	পিগমেন্ট
(১৭)	খনিজ যৌগ যথা ঃ সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও পটাসিয়াম এর ফসফেট, কার্বনেট, সালফেট, ক্লোরাইড, নাইট্রেট লবণসমূহ	(১৮)	সাইট্রেট যৌগ (কার্বহাইড্রেট ও ফেনল)
(১৯)	পিউরিন ও পাইরিমিডিন	(২০)	ট্যানিন, ইত্যাদি।

নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও সালফার জৈব পদার্থ রূপে থাকলেও সহজে নষ্ট হয় না। জৈব পদার্থে কাইটিন, নিউক্লিক এসিড ও নিউক্লিওটাইড নামক ফসফরাসের যৌগ থাকে। বিয়োজনের ফলে এগুলো থেকে ক্যাটায়ন, অর্থোফসফেট বেরিয়ে আসে। এমাইনো এসিড, সিস্টাইন ও সিস্টিন নামক সালফার ঘটিত যৌগও জৈব পদার্থে থাকে। কালক্রমে এরা সালফার এর অজৈব যৌগরূপে দেখা যায়। মৃত্তিকার হিউমাস কণিকায় কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার, ফসফরাস ও অন্যান্য মৌলিক পদার্থ থাকে। দেখা যায় জৈব পদার্থে কার্বন শতকরা ৫০-৬০ ভাগ, নাইট্রোজেন ৩-৬ ভাগ, অক্সিজেন ৩৫ ভাগ, হাইড্রোজেন ৫ ভাগ ও ক্ষার (ছাই) ৫ ভাগ (আনুমানিক) থাকে।

হিউমাসের সংজ্ঞা

মৃত্তিকার জৈব পদার্থ সম্পূর্ণ বিয়োজনের পর অবশিষ্ট দ্রব্য যা তুলনাম লকভাবে স্থায়ী, বিয়োজন প্রতিরোধী, গাঢ় কাল থেকে বাদামী বর্ণের এবং প্রোটিন ও লিগনিন সমন্বয়ে গঠিত, তাকে হিউমাস বলা হয়।

মৃত্তিকার জৈব পদার্থ সম্পূর্ণ বিয়োজনের পর অবশিষ্ট দ্রব্য যা তুলনাম লকভাবে স্থায়ী, বিয়োজন প্রতিরোধী, গাঢ় কাল থেকে বাদামী বর্ণের এবং প্রোটিন ও লিগনিন সমন্বয়ে গঠিত, তাকে হিউমাস বলা হয়। জীবাণুর উৎসেচকের অনুঘটক প্রক্রিয়ার ফলে জৈব পদার্থের বিয়োজন ঘটে থাকে। এ বিয়োজনের উপজাত হলো বাদামী বা গাঢ় বাদামী রংয়ের জটিল অনিয়তাকার অসমসত্ব (Heterogeneous) এক প্রকার মিশ্রণ। লিগনিন, প্রোটিন, ও প্রোটিন কাদা জাতীয় উপরোক্ত পদার্থগুলোই এ মিশ্রণের উপাদান। এ মিশ্রণই হিউমাস।

হিউমাসের বৈশিষ্ট্য

১। গাঢ় বাদামী থেকে কালো বর্ণের।

২। পানিতে অদ্রবণীয় তবে ক্ষারে দ্রবণীয়।

৩। রাসায়নিক গঠন বড়ই জটিল।

৪। শতকরা আনুমানিক ৩০ ভাগ আমিষ, ৩০ ভাগ লিগনিন ও ৩০ ভাগ জটিল চিনি ধারণ করে।

৫। শতকরা ৫৫-৫৮ ভাগ কার্বন, ৩-৬ ভাগ নাইট্রোজেন এবং সিলিকন, এলুমিনিয়াম ও লৌহ ধারণ করে।

৬। কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত ১২ঃ১।

৭। সংকোচন ও প্রসারন গুণে সমৃদ্ধ।

৮। ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা বেশি।

৯। জৈব পদার্থের শতকরা ৮৫-৯০ ভাগই হিউমাস।

হিউমাস ও জৈব পদার্থের পার্থক্য

হিউমাস	জৈব পদার্থ
১। অত্যাধিক বিয়োজিত জৈব অবশিষ্টাংশ	১। অসম্পর্ণ বা আংশিক বিয়োজিত অথবা অবিয়োজিত জৈব অবশিষ্টাংশ
২। তুলনাম লক ভাবে অধিক জটিল	২। কম জটিল
৩। সম্পর্ণ ভাবে স্থায়ী	৩। অস্থায়ী
৪। কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত কম	৪। কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত অধিক
৫। কার্বহাইড্রোটের পরিমাণ কম থাকে	৫। কার্বহাইড্রেটের পরিমাণ অধিক থাকে
৬। প্রোটিন ও লিগনিনের পরিমাণ বেশি থাকে	৬। সামান্য পরিমাণ প্রোটিন ও লিগনিন বিদ্যমান
৭। মূল টিস্যু বা কলা চেনা যায় না	৭। মূল টিস্যু বা কলা চেনা যায়
৮। অধিক গাঢ় রংয়ের	৮। হালকা বা সামন্য গাঢ় বর্ণের
৯। বিয়োজন শেষ হওয়ায় অণুজীব দ্বারা পুনরায় আক্রান্ত হয় না	৯। পুনরায় অণুজীব দ্বারা আক্রান্ত হয়

হিউমাস	জৈব পদার্থ
১০। হিউমিক এসিড বিদ্যমান	১০। হিউমিক এসিড অনুপস্থিত
১১। সর্বদাই মৃত পদার্থ ধারণ করে	১১। জীবিত বা মৃত পদার্থ ধারণ করতে পারে
১২। উর্বরতা মূল্যায়নে গুরুত্ব কম, তবে রসায়ন ও প্রাণ রসায়নে এর তাৎপর্য আছে	১২। মাটির উর্বরতা মূল্যায়নে সহায়ক এবং কৃষিতে এর তাৎপর্য ব্যাপক

কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত (C:N)

মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের মোট কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাতকে কার্বন-নাইট্রোজেন (সি-এন) অনুপাত বলে।

মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের মোট কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাতকে কার্বন-নাইট্রোজেন (সি-এন) অনুপাত বলে। চাষের জমিতে জৈব পদার্থে সি-এন অনুপাত ৮ঃ১ হতে ১৫ঃ১ হতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ১০ঃ১ থেকে ১২ঃ১ থাকে। বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা ও জৈব পদার্থের গুণাগুণ সি-এন অনুপাতের তারমত্য ঘটায়। এখানে একটি তালিকায় বিভিন্ন ধরনের জৈব পদার্থের সি-এন এর অনুপাত সাজানো হলো।

জৈব পদার্থ	সি-এন অনুপাত
১। মৃত্তিকা হিউমাস	১০ঃ১
২। ডাল জাতীয় শস্যের অবশিষ্টাংশ	২০ঃ১ হতে ৩০ঃ১
৩। খামার জাত সার	৯০ঃ১
৪। অণুজীবের দেহ কোষ	৪ঃ১ হতে ৯ঃ১
৫। আলফা আলফা	১৩ঃ১
৬। সবুজ মিষ্টি ক্লোভার	১৬ঃ১
৭। ধান ও গমের খড়/নাড়া	৮০ঃ১ হতে ১০০ঃ১
৮। করাতের গুড়ো	৪০০ঃ১

সি-এন অনুপাতের গুরুত্ব

কোন জৈব পদার্থের সি-এন অনুপাত অধিক হলে বুঝা যায় তাতে কার্বনের পরিমাণ বেশি ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম এবং তা পুনরায় বিয়োজিত হবে।

কোন জৈব পদার্থের সি-এন অনুপাত অধিক হলে বুঝা যায় তাতে কার্বনের পরিমাণ বেশি ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম এবং তা পুনরায় বিয়োজিত হবে।

কোন মাটিতে অধিক সি-এন অনুপাত যুক্ত জৈব পদার্থ প্রয়োগ করলে তার হেটারোট্রফিক (Heterotrophic) জীবাণু যথাঃ ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও একটিনোমাইসিটিস অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠে এবং ঐ জৈব পদার্থের বিভাজন/বিশেষণ ঘটায়। এতে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা অণুজীবরা তাদের বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করে এবং দ্রুত বংশ বিস্তার করে। দেখা গিয়েছে যে, প্রায় ৩৫% কার্বন অণুজীবরা জৈব পদার্থ হতে গ্রহণ করে এবং বাকী ৬৫% কার্বন বায়বীয় অবস্থায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং জলাবদ্ধ অবস্থায় H_2CO_3 এবং CH_4 এ পরিণত হয়।

এই অধিক সংখ্যক জীবাণু দেহগঠনের জন্য মাটির অজৈব NH_4^+, NO_3^- গ্রহণ করে এবং নিজেদের দেহে জৈব অবস্থায় রূপান্তরিত করে।

এটা সুস্পষ্ট যে, অধিক সি-এন যুক্ত জৈব পদার্থ মাটিতে প্রয়োগ করলে অণুজীবের কার্যকারীতা ও নাইট্রোজেনের সহজলভ্যতা বেড়ে যায়।

কিছু নাইট্রোজেন গাছ গ্রহণ করে এবং বাকীটুকু NO_3^- অবস্থায় চুয়ানের মাধ্যমে অপচয় হয়। এই চুয়ানোর ফলে সি-এন অনুপাত কমে ১০ঃ১ অনুপাতে নেমে আসে যা সমস্ত কৃষি শস্যের জন্য উপযোগী। এ সময়ে কার্বনের পরিমাণ কমে যাওয়ায় অণুজীবসম হ মারা যায় এবং তাদের দেহ পুনরায় বিয়োজিত হয় এবং মাটিতে নাইট্রোজেন মুক্ত হয় যা গাছের জন্য সহজে গ্রহণযোগ্য।

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, অধিক সি-এন যুক্ত জৈব পদার্থ মাটিতে প্রয়োগ করলে অণুজীবের কার্যকারীতা ও নাইট্রোজেনের সহজলভ্যতা বেড়ে যায়।

অনুশীলন (Activity) *ঃ উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও উন্নয়নে মৃত্তিকার কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাতের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।*

হিউমিক এসিডের বৈশিষ্ট্য

হিউমিক এসিড শতকরা ৫০-৬০ ভাগ কার্বন, ৪ ভাগ হাইড্রোজেন, ৪০ ভাগ অক্সিজেন ধারণ করে এবং কার্বন ও নাইট্রোজেন অনুপাত ১৪ঃ১।

১। হিউমিক এসিড শতকরা ৫০-৬০ ভাগ কার্বন, ৪ ভাগ হাইড্রোজেন, ৪০ ভাগ অক্সিজেন ধারণ করে এবং কার্বন ও নাইট্রোজেন অনুপাত ১৪ঃ১।

২। ইহা উচ্চ আণবিক ওজন (৩০,০০০ - ৫০,০০০) সম্পন্ন যৌগ।

৩। ইহা উচ্চ ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা সম্পন্ন (৫৪৯ মিঃতুঃ/১০০ গ্রাম মাটি)।

৪। সংযুক্তিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ পরিবর্তনশীল।

৫। পডজল ও চারনোজেম মাটি থেকে নিষ্কাশিত হিউমিক এসিড হাইড্রোফিলিক।

ফালভিক এসিডের বৈশিষ্ট্য

১। ক্রিণিক এসিড ও এপোক্রিনিক এসিড যৌথভাবে ফালভিক এসিড বলে পরিচিত।

২। ফালভিক এসিড শতকরা ৪০-৪৭ ভাগ কার্বন ও ৪২-৫০ ভাগ অক্সিজেন ধারণ করে।

৩। উচ্চ আণবিক ওজন সম্পন্ন যৌগ।

৪। পানি, এলকোহল ও ক্ষারে দ্রবণীয়।

৫। অল্প ঘনত্বের ফালভিক এসিড হালকা হলুদ, তবে অধিক ঘনত্বের হলে কমলা হলুদ রঙের হয়।

৬। ক্রিনিক এসিড হলদে ও এপোক্রিনিক এসিড বাদামী রংয়ের হয়ে থাকে।

৭। ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা ৩০০-৪০০ মিঃতুঃ/১০০ গ্রাম মাটি।

৮। এতে কার্বোক্সিল, মিথোক্সিল ও হাইড্রোক্সিল গ্রুপ বিদ্যমান, ফলে পার্শ্ব বিক্রিয়ার প্রভাব অধিক।

অনুশীলন (Activity) *t হিউমিক এসিড ও ফালভিক এসিডের বৈশিষ্ট্য তুলনা করুন।*

হিউমিন ও এলমিনের বৈশিষ্ট্য

১। এরা যথাক্রমে হিউমিক ও এলমিক এসিড, তবে অণু ছোট।

২। এরা প্রকৃত হিউমিক এসিড তবে মাটির খনিজ অংশের সাথে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলায় ক্ষারে অদ্রবণীয়।

৩। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সালফার ও অন্যান্য মৌল ধারণ করে।

হেমাটোমেলানিক এসিডের বৈশিষ্ট্য

১। আণবিক ওজন প্রায় ৮০০।

২। কার্বনের পরিমাণ অন্যান্য এসিডের তুলনায় বেশি।

৩। ইহা পানি, এলকোহল ও ক্ষারে দ্রবণীয়।

৪। হিউমিক এসিডের ডেরিভেটিভ।

৫। এতে কার্বোক্সিল, ফেনোলিক ও মিথোক্সিল গ্রুপ বিদ্যমান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। জৈব পদার্থে হিউমাসের শতকরা পরিমাণ কত?

- ক) ৫০-৮০
- খ) ৮০-১০০
- গ) ৮৫-৯০
- ঘ) ৪০-৭০

২। হিউমাস কোনটিতে দ্রবণীয়?

- ক) পানিতে
- খ) ক্ষারে
- গ) পানি ও ক্ষারে সমান
- ঘ) পানিতে বেশি ক্ষারে কম

৩। হিউমিক এসিডের ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা কত?

- ক) ২০০ মি.তু./১০০ গ্রাম মাটি
- খ) ৪৪৮ মি.তু./১০০ গ্রাম মাটি
- গ) ৫০০ মি.তু./১০০ গ্রাম মাটি
- ঘ) ৫৪৯ মি.তু./১০০ গ্রাম মাটি

৪। হেমাটোমেলানিক এসিডের আণবিক ওজন কত?

- ক) ৮০০
- খ) ৬০০
- গ) ৪০০
- ঘ) ২০০

৫। ফালভিক এসিডে কার্বন ও অক্সিজেনের শতকরা পরিমাণ কত?

- ক) কার্বন ৪০-৫০ ও অক্সিজেন ৩০-৫০
- খ) কার্বন ৪০-৪৭ ও অক্সিজেন ৪২-৫০
- গ) কার্বন ৩০-৫০ ও অক্সিজেন ৩০-৬০
- ঘ) কার্বন ৩৫-৪৫ ও অক্সিজেন ৪৫-৫০

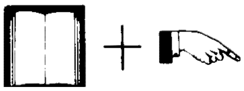

পাঠ ৪.২ জৈব পদার্থের গুরুত্ব

এ পাঠ শেষে আপনি –

- জৈব পদার্থের সংজ্ঞা ও উৎস বলতে এবং লিখতে পারবেন।
- মৃত্তিকার ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলীতে জৈব পদার্থের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- গাছপালার ওপর জৈব পদার্থের গুরুত্ব তুলে ধরতে পারবেন।
- জৈব পদার্থ ও হিউমাসের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরতে পারবেন।

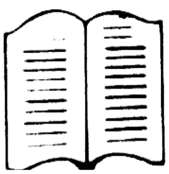

জৈব পদার্থের সংজ্ঞা

উদ্ভিদ ও প্রাণীর অবশিষ্টাংশ, অণুজীব ও মৃত্তিকাস্থিত জীবের কোষকলা বিযোজিত (Decomposed) হয়ে যে গাঢ় দ্রব্য অবশিষ্ট থাকে তাকে মৃত্তিকা জৈব পদার্থ বলে। জৈব পদার্থকে মৃত্তিকার প্রাণ বলা হয়।

জৈব পদার্থের উৎস

অসংখ্য উৎস থেকে জৈব পদার্থ মৃত্তিকায় মজুদ হয়। এগুলো হচ্ছে ফসলের অবশিষ্টাংশ, কান্ড, পাতা,

সবুজ সার, গোবর, খৈল, খামারজাত সার, কম্পোস্ট, ডাস্টবিনের আর্বজনা, ঘরবাড়ীর আবর্জনা, পরিত্যক্ত কাগজ, শহর বন্দরের আবর্জনা, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগীর মল ও ব্যবহৃত খাদ্যদ্রব্য বন-জঙ্গলে পরিত্যক্ত পাতা, হার্ব, ঘাসের শিকড়, ঘাস, ধনচে, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, প্রটোজোয়া, কেঁচো, শৈবাল, প্রভৃতির মৃতদেহ, মেরুদন্ডী ও অমেরুদন্ডী প্রাণীর মৃতদেহ, কলকারখানার বিশেষ বিশেষ কাঁচামাল প্রভৃতি।

> মৃত্তিকার ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলীতে জৈব পদার্থের গুরুত্ব অপরীসীম। জৈব পদার্থকে মাটির প্রাণ বলা হয়।

মৃত্তিকার ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলীতে জৈব পদার্থের গুরুত্ব

মৃত্তিকার ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলীতে জৈব পদার্থের গুরুত্ব অপরিসীম। জৈব পদার্থকে মাটির প্রাণ বলা হয়।

ভৌত গুণাবলীতে জৈব পদার্থের গুরুত্ব

> মৃত্তিকার ভৌত ধর্মাবলী যেমন ঘনত্ব, পানি ধারণ, বুনট, রন্ধ্রতা ইত্যাদি জৈব পদার্থের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত।

১। মৃত্তিকার রং ধূসর, গাঢ় ধূসর, বাদামী, গাঢ় বাদামী, কিংবা কাল করতে সাহায্য করে।

২। মৃত্তিকার ভৌত ধর্মাবলী যেমন ঘনত্ব, পানি ধারণ, বুনট, রন্ধ্রতা ইত্যাদি জৈব পদার্থের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত।

৩। মৃত্তিকার তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

৪। মৃত্তিকায় বায়ু চলাচল বৃদ্ধি করে।

৫। মৃত্তিকার সংযুক্তি ও দলা উন্নত করে।

৬। পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ায় ও পানির অপচয় রোধ করে।

৭। মৃত্তিকার উপরিভাগে আস্তরণ তৈরি হওয়া বন্ধ রাখে।

৮। বেলে ও কাদা মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ায়।

৯। ভূমিক্ষয় রোধ করে।

১০। দুর্বহ (হেভী) এঁটেল মাটি সুবহ (হালকা) করে তোলে।

মৃত্তিকার রাসায়নিক গুণাবলীতে জৈব পদার্থের গুরুত্ব

১। উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যোপাদান মজুদ রাখে এবং প্রয়োজনমত সরবরাহ করে। কারণ জৈব পদার্থকে উদ্ভিদের খাদ্য ভান্ডার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২। মৃত্তিকা নাইট্রোজেনের প্রায় ৯৮% বিভিন্ন জৈব যৌগে থাকে যা উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

৩। জৈব এসিড ও কার্বনিক এসিড তৈরি করে মৃত্তিকার ক্ষারকত্ব কমায়।

৪। চুন বা রাসায়নিক সার প্রয়োগে মৃত্তিকায় যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তা প্রশমিত করতে জৈব পদার্থ বাফার হিসেবে কাজ করে।

৫। সার ও মৃত্তিকাস্থিত অন্যান্য উপাদান বা পুষ্টি উপাদানের মধ্যে সুষম সম্পর্ক বজায় রাখে।

৬। সার ও অন্যান্য খনিজ হতে যে সকল পুষ্টি উপাদান মুক্ত হয় জৈব কোলয়েড সেগুলো শক্তভাবে আটকে ধরে রাখে ফলে চুয়ানী ক্ষয় কমে আসে।

> সার ও অন্যান্য খনিজ হতে যে সকল পুষ্টি উপাদান মুক্ত হয় জৈব কোলয়েড সেগুলো শক্তভাবে আটকে ধরে রাখে ফলে চুয়ানী ক্ষয় কমে আসে।

৭। জৈব পদার্থ বিয়োজনের ফলে যে সব আয়ন মুক্ত হয় তা উদ্ভিদ বৃদ্ধির সহায়ক।

৮। মৃত্তিকায় ক্যাটায়ন বিশেষ করে পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, এমোনিয়াম প্রভৃতির বিনিময় ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গাছের পুষ্টি উপাদানের সহজলভ্যতা বাড়ায়।

৯। পেস্টিসাইড ব্যবহারে মৃত্তিকায় যে বিষ জমা হয় জৈব পদার্থ ঐ সব বিষাক্তদ্রব্য শুষে নেয় ।

১০। সেলুলোজ ও হেমিসেলুলোজের রাসায়নিক প্রকৃতি মাটির পানি শোষণ ত্বরান্বিত করে।

১১। অম্ল মাটিতে জৈব পদার্থ লৌহ, এলুমিনিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ এর সাথে বিক্রিয়া করে স্থায়ী কমপক্ষে গঠন করে ফলে ফসফরাস ফিক্সেশন বাধা পেয়ে ফসফরাসের সহজলভ্যতা বেড়ে যায়।

১২। মৃত্তিকায় জারণ ও বিজারণ বিক্রিয়ায় অসামান্য প্রভাব ফেলে।

১৩। জৈব পদার্থে কার্বন, হাইড্রোজেন, আক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার, ফসফরাস ও অন্যান্য মৌলিক পদার্থ থাকে যা উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান হিসেবে বিবেচিত।

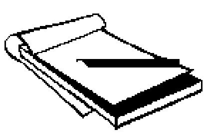

অনুশীলন* *(Activity)* ঃ *"জৈব পদার্থকে উদ্ভিদের খাদ্য ভান্ডার বলা হয়"- এ উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করুন।

মৃত্তিকার জৈবিক গুণাবলীতে জৈব পদার্থের গুরুত্ব

> ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, মাইকোরাইজা এলজি, একটিনোমাইসিটিস প্রভৃতি অণুজীব মৃত্তিকার উর্বরতায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। মৃত্তিকায় জৈব পদার্থ না থাকলে এসব জীবাণুর সংখ্যা কমে যায় ফলে মৃত্তিকার উর্বরতা ব্যহত হয়।

১। জৈব পদার্থের প্রধান উপকরণ হচ্ছে কার্বন। কার্বন জারিত হওয়ার ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয় সে শক্তি গ্রহণ করেই মাটিতে জীবাণুরা তাদের কার্যক্ষমতা রক্ষা করে। যে মাটিতে যত বেশি কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়, সে মাটিতে তত অধিক জীবাণু থাকে। ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, মাইকোরাইজা, শেওলা, একটিনোমাইসিটিস প্রভৃতি অণুজীব মৃত্তিকার উর্বরতায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। মৃত্তিকায় জৈব পদার্থ না থাকলে এসব জীবাণুর সংখ্যা কমে যায় ফলে মৃত্তিকার উর্বরতা ব্যহত হয়।

২। কেঁচো, পিঁপড়া, উইপোকা, ইঁদুর, সেন্টিপেড ইত্যাদি জীব জৈব পদার্থ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। এরা মাটিতে গর্ত করে, ফলে শিকড় অধিক পরিমাণ অক্সিজেন পায়, গাছের বৃদ্ধি ও সতেজতা বাড়ে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড সহজে বের হয়ে যেতে পারে।

৩। মৃত্তিকা জৈব পদার্থ মৃত্তিকা অণুজীবের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে।

৪। জৈব পদার্থস্থিত প্রোটিন মৃত্তিকাস্থ অণুজীব দ্বারা ভেঙ্গে বিভিন্ন অ্যামাইনো এসিড উৎপন্ন করে। এনজাইমের সাহায্যে এমোনিয়াম যৌগ তৈরি করে ও সর্বশেষে নাইট্রেটে রূপান্তরিত হয়। ফলে গাছের পক্ষে এমোনিয়াম ও নাইট্রেট গ্রহণ সহজতর হয়। মৃত্তিকা জৈব পদার্থ উল্লিখিত অণুজীবের (ব্যাকটেরিয়া) সংখ্যা বাড়ায়।

গাছপালার উপর জৈব পদার্থের প্রভাব বা গুরুত্ব

জৈব পদার্থ গাছপালার জন্য অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে। মাটিতে জৈব পদার্থের ঘাটতি হলে কোন গাছপালা ভালভাবে বাড়তে পারে না এবং ফসলের ফলনও কমে যায়।

জৈব পদার্থ গাছপালার জন্য অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে। মাটিতে জৈব পদার্থের ঘাটতি হলে কোন গাছপালা ভালভাবে বাড়তে পারে না এবং ফসলের ফলনও কমে যায়। কোন কোন গাছ জৈব নাইট্রোজেনও গ্রহণ করতে পারে। তবে পরিমাণে অতি সামান্য, অর্থাৎ প্রয়োজনের অতি সামান্য অংশ পূরণ করতে পারে। জৈব পদার্থ গাছের বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় অজৈব নাইট্রোজেন ও সালফার সরবরাহে সহায়তা করে। তাছাড়া ইহা কার্বন, হাইড্রোজেন এবং পানিরও অন্যতম উৎস। জৈব পদার্থ শুধু যে গাছপালার খাদ্যের উৎস তা নয়, ইহা মৃত্তিকায় ভিটামিন ও হরমোন জাতীয় পদার্থেরও যোগান দেয়। জৈব পদার্থ বিয়োজিত হয়ে এ সকল পদার্থ মুক্ত হয়। পরিমাণের দিক থেকে সামান্য হলেও গাছপালার বৃদ্ধিতে অসামান্য প্রভাব ফেলে। জৈব পদার্থ সরাসরি মালচিং হিসাবেও কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আবার গাছপালা লাগিয়ে গোড়ায় জৈব পদার্থ মালচিং আকারে দেয়া হয় যাতে গোড়ার মাটি বৃষ্টিতে ধুয়ে না যায়। যুগ যুগ ধরে চাষাবাদের ফলে মাটির যে গুণগত মান হ্রাস পায় এবং ফসলের ফলনের ওপর প্রভাব ফেলে জৈব পদার্থ মাটির এ সুস্থতা নিশ্চিত করে। বীজের অংকুরোদগম, শিকড়ের বৃদ্ধি ও উন্নয়ন জৈব পদার্থ দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়।

কখনও কখনও জৈব পদার্থ গাছপালার পক্ষে অনিষ্টকর হয়ে উঠতে পারে। জৈব পদার্থ থেকে ডাই-হাইড্রোস্টিয়ারিক এসিড নামক পদার্থ উৎপন্ন হতে পারে যা গাছপালার পক্ষে ক্ষতিকর। অতিরিক্ত পানি জমে এরূপ পদার্থ উৎপন্ন হয়। সুষ্ঠু পানি নিষ্কাশন, চুন প্রয়োগ, যথাযথ সার ও উন্নত বৈজ্ঞানিক চাষাবাদে এ অবস্থার উন্নতি হয় এবং ক্ষতিকর যৌগগুলো আপনা থেকে নষ্ট হয়। মৃত্তিকা জৈব পদার্থের সুষ্ঠু পচনের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে।

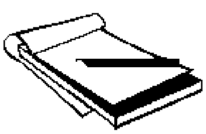

অনুশীলন (Activity) *ঃ বাংলাদেশের মৃত্তিকায় জৈব পদার্থ কমে যাবার কারণসমূহ চিহ্নিত করুন। এদেশের ফসলের জমিতে জৈবপদার্থ বৃদ্ধিতে কী কী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। জৈব পদার্থের উৎস গুলো কী কী?
   - ক) গোবর, গাছপালার লতাপাতা, আবর্জনা প্রভৃতি
   - খ) ইটের গুড়া, পাথর, রড ইত্যাদি
   - গ) কাপড়, কাগজ, কলকারখানার ফেলে দেয়া যন্ত্রাংশ ইত্যাদি
   - ঘ) প্লাস্টিকের হাঁড়ি পাতিল, পলিথিন ব্যাগ ইত্যাদি

২। জৈব পদার্থের ভৌত গুণাবলী কী কী?
   - ক) অণুজীবের ক্ষমতা বাড়ায়
   - খ) পিএইচ মান ঠিক রাখে
   - গ) মাটির বিষাক্ত পদার্থ শোষণ করে নেয়
   - ঘ) মাটির বুনট, সংযুক্তি ও পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়

৩। মৃত্তিকার রাসায়নিক গুণাবলীতে জৈব পদার্থের ভূমিকা কোনটি?
   - ক) অণুজীবের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে
   - খ) মাটির ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা বাড়ায়
   - গ) ভূমিক্ষয় রোধ করে
   - ঘ) তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে

৪। মৃত্তিকার জৈবিক গুণাবলীতে জৈব পদার্থের প্রভাব কোনটি?
   - ক) বেলে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ায়
   - খ) মাটির পুষ্টি উপাদান মজুদ রাখে
   - গ) অণুজীবের সংখ্যা বৃদ্ধি করে
   - ঘ) মাটিতে বায়ু চলাচল নিশ্চিত করে

৫। মৃত্তিকা জৈব পদার্থ সঠিক পচানো হলে কী হয়?
   - ক) পরিবেশ ভারসাম্য বজায় থাকে
   - খ) পরিবেশে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে
   - গ) চারদিকে মারাত্মক গন্ধ ছড়ায়
   - ঘ) পরিবেশ বিজ্ঞানীরা সমস্যায় পড়ে যায়

পাঠ ৪.৩ মৃত্তিকা জীব

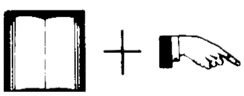

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ♦ মৃত্তিকা জীবের সংজ্ঞা দিতে পারবেন এবং শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।
- ♦ মৃত্তিকা জীবের কার্যাবলীর তালিকা প্রস্তুত করতে পারবেন।
- ♦ কেঁচোর প্রোটোজোয়া, নেমাটোড, রোটিফারস প্রভৃতি মৃত্তিকা জীবের পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব তুলে ধরতে পারবেন।

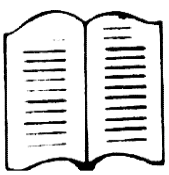

মৃত্তিকা জীব ও এদের শ্রেণিবিভাগ

মৃত্তিকায় অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী জৈব পদার্থ বিয়োজন বা বিশ্লেষণ করে মাটিকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখার জন্য বিভিন্নভাবে সহায়তা করে থাকে। এদের অধিকাংশই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে হয়। তবে মুষ্টিমেয় কতকগুলো খালি চোখেও দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা এ জীব জগতের শ্রেণিবিভাগ

করছেন। মৃত্তিকা বড় জীব সম হকে প্রধানত দু'টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা ঃ মৃত্তিকা প্রাণী ও মৃত্তিকা উদ্ভিদ। এখানে মৃত্তিকা জীবের বিস্তারিত শ্রেণিবিভাগ দেখানো হলো। এ পাঠে মৃত্তিকাস্থিত জীব কেঁচো (বড় প্রাণী) এবং প্রোটোজোয়া, নেমাটোড ও রোটিফারস (ছোট প্রাণী) এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

মৃত্তিকা জীব (বড়)

- শিকারী
  - পিঁপড়া
  - কাঠ বিড়ালী
  - শতপদী
  - মাকড়শা
- উদ্ভিদভোজী
  - কেঁচো
  - যুগ্নপদী
    - বিটলপোকা
    - পিপড়া
    - শুককীট
    - মিলিপদী
    - আটালী
  - শামুক
    - শাগ
    - ঝিনুক
- গর্তখননকারী
  - স্তন্যপায়ী
  - গফার
  - উডচাক
  - ইঁদুর
  - বাতিয়ন

স্প্রীংটেইলস

মৃত্তিকা জীবের শ্রেণিবিভাগ (আমিন, ১৯৯০)

মৃত্তিকা জীবসম হের (মৃত্তিকাস্থ বড় প্রাণী) কার্যাবলী

মৃত্তিকায় বড় রন্ধ্রতে বা গর্তকরে নানা প্রকার বড় প্রাণী বসবাস করে। অবশ্য এদের আকৃতি ও প্রকৃতিতে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। ইদুঁর, পোকামাকড়, মাইট, শামুক, গুগলি, কেঁচো, মিলিপেড ও সেন্টিপেড এদের মধ্যে অন্যতম। এ সকল জীবের সাধারণ কার্যাবলী এখানে দেয়া হলো ঃ

> মৃত্তিকা জীবসমূহ মাটি ওলট পালট করে দানা বাধায় সাহায্য করে, বিশেষ করে এক স্থানের মাটি অন্যস্থানে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

১। মৃত্তিকা জীবসম হ মাটি ওলট পালট করে দানা বাধায় সাহায্য করে, বিশেষ করে এক স্থানের মাটি অন্যস্থানে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

২। মাটির সংযুক্তি ও বুনটের উন্নতি হয় এবং রন্ধ্র সমূহ বায়ু চলাচল সুনিশ্চিত করে।

৩। পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়।

৪। ইঁদুর, কেঁচো ও অন্যান্য পোকা মাকড়ের বাসা ও তৈরি নালা দিয়ে বায়ু ও পানি একস্থান হতে অন্যান্য স্থানে সহজে যেতে পারে।

৫। এদের মৃতদেহ পচনের ফলে মৃত্তিকার জৈব পদার্থ বাড়ে।

৬। জৈব পদার্থ স্থানান্তরে সহায়তা করে।

৭। মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়ায় বিশেষ করে ইঁদুর ধান, গম ইত্যাদি খড় কুটা সংগ্রহ করে যা গর্তে পচে।

৮। মিলিপেড, সেন্টিপেড, মাইট, শামুক, গুগলি প্রভৃতি প্রাণী জৈব পদার্থ খেয়ে ফেলে এবং বিয়োজিত জৈব পদার্থ মল হিসাবে ত্যাগ করে। যা উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে থাকে।

কেঁচো

> কেঁচো মৃত্তিকাস্থিত বড় ধরনের প্রাণী। কৃষিতে এর গুরুত্ব ব্যাপক, বিশেষ করে মাটির গঠন ও উর্বরতা বৃদ্ধিতে কেঁচোর ভূমিকা

কেঁচো মৃত্তিকাস্থিত বড় ধরনের প্রাণী। কৃষিতে এর গুরুত্ব ব্যাপক, বিশেষ করে মাটির গঠন ও উর্বরতা বৃদ্ধিতে কেঁচোর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এরা মাটিতে বসবাস করে এবং মাটি খেয়েই বেঁচে থাকে। কেঁচো সাধারণত ভিজে অথচ বায়ু চলাচল করে এমন মাটিতে বসবাস করতে পছন্দ করে। বস্তুতঃ

স্যাঁতসেঁতে মাটির এক মিটার পর্যন্ত উপরিভাগে বাস করে। রাতে খাদ্যের সন্ধানে গর্ত থেকে বের হয় কিন্তু দিনের আলোতে গর্তে থাকে। বৃষ্টি বা বন্যার পানিতে গর্ত ডুবে গেলে এরা নিকটবর্তী উপযুক্ত স্থানে চলে যায় তবে শুকনো মাটি এদের বসবাসযোগ্য নয়। উর্বর মাঝারি উচু জমিতে অধিক হারে থাকে কিন্তু শুষ্ক বেলে মাটি, জলাবদ্ধস্থান ও নিচু জমিতে এদের সংখ্যা কম। অম্ল মাটিতে সকল প্রজাতির কেঁচো বসবাস করতে পারে না।

গোটাবিশ্বে প্রায় সাত হাজার কেঁচো প্রজাতি রয়েছে। তন্মধ্যে দুশ' প্রজাতির কেঁচো মাটিতে দেখা যায়। ভারত বর্ষে *পেরিটিমা পাসথুমা* প্রজাতিই প্রধান। তবে শীত প্রধান দেশের মাটিতে *লামব্রিকাস টেরিট্রিস* বা নৈশ কেঁচো ও এ্যালোবোফোরা ক্যালিজিনোসা বা গোলাপী কেঁচো অধিক পাওয়া যায়। মূলতঃ কৃষি জমিতে নৈশ, গোলাপী, বাগান ও রুবেলাস এ চার প্রকার কেঁচোই সচরাচর দেখা যায়।

মৃত্তিকা উর্বরতা বৃদ্ধিতে কেঁচোর প্রভাব

১। এক হেক্টর জমিতে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কেঁচো বসবাস করে। এরা গর্ত করার সময় সন্মুখের প্রায় ৪৫ হাজার টন মাটি পর্যায়ক্রমে ভক্ষণ ও মল ত্যাগ করে। সাধারণত কেঁচোর মলে ব্যাকটেরিয়া ও জৈব পদার্থ থাকে।

২। মাটিতে নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, পটাশ ও ফসফরাস ইত্যাদি অনেকটা বেশি পরিমাণে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় চলে আসে।

৩। কেঁচো মাটিতে গর্তের মাধ্যমে বায়ু পানি চলাচল বাড়ায়। আসলে কেঁচো না থাকলে উদ্ভিদের শিকড় বায়ুর অভাবে মরে যেত।

৪। মাটিতে গর্ত করে মাটির ওলট পালটের মাধ্যমে মাটির ভৌত ও রাসায়নিক অবস্থার উন্নয়ন করে। মাটি নরম রাখে ও উর্বরতা সুনিশ্চিত করে। তাই কেঁচোকে কৃষকের বন্ধু বা প্রাকৃতিক লাঙ্গল বলে।

মাটিতে গর্ত করে মাটির ওলট পালটের মাধ্যমে মাটির ভৌত ও রাসায়নিক অবস্থার উন্নয়ন করে। মাটি নরম রাখে ও উর্বরতা সুনিশ্চিত করে। তাই কেঁচোকে কৃষকের বন্ধু বা প্রাকৃতিক লাঙ্গল বলে।

৫। কতক কেঁচো পচনশীল জৈব পদার্থ ভক্ষণ করে। কেঁচোর মাটি দেখে মৃত্তিকার জৈব পদার্থের পরিমাণ অনুমান করা যায়।

৬। এরা জৈব ও খনিজ পদার্থের উত্তম মিশ্রণ ঘটিয়ে মাটির উর্বরতা বাড়ায়।

৭। আয়ন বিনিময় প্রক্রিয়ায় দ্রুত সহায়তা করে।

৮। মাটির ক্ষারীয় দ্রব্য সরবরাহ সংরক্ষণ করে প্রশমতা সুনিশ্চিত করে।

৯। কেঁচোর মলে উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ পাশাপাশি মাটি থেকে কয়েকগুণ বেশি হয়ে থাকে।

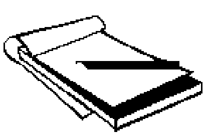

অনুশীলন (Activity) *ঃ কেঁচোকে প্রাকৃতিক লাঙ্গল বলা হয় কেন? উদ্ভিদের বৃদ্ধি-উন্নয়নে কেঁচোর ভূমিকা উল্লেখপূর্বক উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।*

মৃত্তিকায় কেঁচোর অনুকূল অবস্থা

১। **মৃত্তিকা পানির পরিমাণ** মৃত্তিকা নির্দিষ্ট মাত্রায় আর্দ্র থাকতে হবে।

২। **মাটির কণা ও বুনট**-এটেল মাটিতে বেশি কিন্তু বেলে মাটিতে কম কেঁচো উপস্থিত থাকে।

৩। **জৈব পদার্থ**-গোবর কম্পোস্ট প্রয়োগে কেঁচো বাড়ে। জৈব পদার্থ যত বেশি হবে কেচোঁর পরিমাণ তত বেশি হয়ে থাকে।

৪। **পিএইচ**-উত্তম পিএইচ মান ৬-৭।

৫। **মাটির উত্তাপ**- অতিরিক্ত তাপমাত্রা, অতি শীত ও তুষারপাতে কেঁচো কমে যায়।

৬। **চাষাবাদ**- অনাবাদী জমির চেয়ে আবাদী জমিতে কেঁচোর সংখ্যা বাড়ে।

প্রোটোজোয়া

এরা এককোষী প্রাণী। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। আকারে এরা ব্যাকটেরিয়া থেকে বড়। এরা তিন প্রকার যথা- (১) সিলিয়েটস, ইনফিউসোরিয়া বা পক্ষল, (২) বেত্রাকার বা ফ্লাজেটেটিস্, (৩) অ্যামিবা। পক্ষলের সুতোর মত চুল থাকে, এবং বেত্রাকারের থাকে বেতের মতো বেড়ে থাকা প্রোটোপ্লাজমের অঙ্গ। তবে অ্যামিবা একটু ভিন্ন। মাটিতে ২৫০ প্রজাতির প্রোটোজোয়া দেখা যায় এবং এমনকী ভারতের মাটিতে ৪০-৫০ প্রজাতির প্রোটোজোয়া দেখা যায়। এক গ্রাম মাটিতে এদের সংখ্যা দশ লক্ষ হতে পারে। এক গ্রাম মাটিতে পক্ষল ৮০-১০০০, বেত্রাকার ৫-১০ লক্ষ এবং অ্যামিবা ১-৫ লক্ষ থাকতে পারে। খাদ্য ও বায়ু চলাচলের সুবিধার ওপর এদের সংখ্যা নির্ভর করে। এদের খাদ্য জৈব পদার্থ ও ব্যাকটেরিয়া। জলাবদ্ধ স্থানে কিংবা অধিক জৈব পদার্থ থাকলে এরা ব্যাকটেরিয়া খায়। এরা রোগজীবাণুও খায়। এরা মৃত্তিকায় যা কিছু করুক উর্বরতা তারমত্য ঘটে না বরং গাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়। এদের খাদ্য গ্রহণ ৩ রকম যথা- (১) কারো শরীরে ক্লোরোফিল থাকে ফলে স্বভোজী হয়, (২) কেহ মৃতজীবির মত খায় (৩) কেহ ব্যাকটেরিয়ার মত শক্ত খাদ্য নেয় ও হজম করে।

চিত্র ৮ ঃ প্রোটোজোয়া

নেমাটোড

সকল প্রকার মৃত্তিকায় নেমাটোড রয়েছে। এরা দেখতে গোলাকার মাঝ খানটা একটু উঁচু, পিছন দিকটা সরু ও সুচাল; লম্বায় ০.৫-১.৫ মি.মি.। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। এক গ্রাম মাটিতে ৫০টি নেমাটোড দেখা যায় এবং এ হিসাবে একর প্রতি এদের সংখ্যা দাঁড়ায় সাড়ে চার কোটি। মাটিতে জৈব পদার্থ বেশি থাকলে এদের সংখ্যা বাড়ে। খাদ্যের ভিত্তিতে এদেরকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়ঃ ১। জৈব পদার্থ ভোজী যাদের খাদ্য বিয়োজিত জৈব পদার্থ, ২। প্রাণীভোজী- যাদের খাদ্য নেমাটোড, ব্যাকটেরিয়া, শেওলা, ছত্রাক, প্রোটোজোয়া, ছোট কেঁচো প্রভৃতি। (৩) পর ভোজী - যারা গাছের শিকড়ে প্রবেশ করে এবং কোষের ভিতর আশ্রয় নেয়। এদের মধ্যে পরভোজী বেশি ক্ষতিকর। এরা গাছপালার শিকড়ে প্রবেশ করে রস শোষণ করে। মটর, বরবটি, গাজর, তামাক, আলু, কুমড়া প্রভৃতি ফসলের পক্ষে এরা ক্ষতিকর। পরভোজী নেমাটোড ফসলের বিভিন্ন মারাত্বক রোগ সৃষ্টি করে।

এক গ্রাম মাটিতে ৫০টি নেমাটোড দেখা যায় এবং এ হিসাবে একর প্রতি এদের সংখ্যা দাঁড়ায় সাড়ে চার কোটি।

চিত্র ৯ ঃ নেমাটোড বা কৃমি

রোটিফারস

এরা এক ধরনের প্রাণী। ভিজা মাটিতে এরা বসবাস করে। তবে স্যাঁতসেঁতে ও জলাভূমিতে এদের সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পায়। এরা অতি ছোট। খালি চোখে প্রায়ই দেখা যায় না, তবে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে ভাল দেখা যায়। সামনের দিকটা চ্যাপ্টা চাকতির মতো দেখায়। এ চাকতির মতো জিনিসটার চারপাশে অসংখ্য সরু চুলের মতো পদার্থ থাকে। এ চুল দিয়ে পানিতে ভেসে থাকা খাবার অতি সহজে টেনে এনে খেয়ে ফেলে। এদের পিছন দিকটা সরু থাকে। ফলে নানা পদার্থ জড়িয়ে ধরতে পারে। রোটিফারস নিয়ে মৃত্তিকা বিজ্ঞানে গবেষণা আজও সীমিত। এরা পীট মাটিতে জৈব পদার্থ বিয়োজনে অংশ গ্রহণ করে।

রোটিফারস নিয়ে মৃত্তিকা বিজ্ঞানে গবেষণা আজও সীমিত। এরা পীট মাটিতে জৈব পদার্থ বিয়োজনে অংশ গ্রহণ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। সাধারণত মাটিতে কত প্রজাতির কেঁচো দেখা যায়?

ক) ১০০

খ) ২০০

গ) ৩০০
ঘ) ৪০০

২। কোন্ মাটিতে কেঁচোর সংখ্যা কম?
ক) জৈব পদার্থযুক্ত
খ) কাদা মাটি
গ) বেলে মাটি
ঘ) উর্বর মাটি

৩। এক গ্রাম মাটিতে পক্ষল প্রোটোজোয়ার সংখ্যা কত?
ক) ৫০-৫০০
খ) ৬০-৮০০
গ) ৭০-৯০০
ঘ) ৮০-১০০০

৪। নেমাটোড কোন্ গাছের পক্ষে ক্ষতিকর?
ক) কলা, পিয়াজ, রসুন প্রভৃতি
খ) মটর, তামাক, আলু ইত্যাদি
গ) ধান, পাট, সরিষা ইত্যাদি
ঘ) গম, ভূটা, ডাল প্রভৃতি

৫। মৃত্তিকা জীব কোন্‌গুলো?
ক) বিড়াল, শিয়াল, কুকুর প্রভৃতি
খ) কাক, শালিক, চড়ূই ইত্যাদি
গ) শিং, বোয়াল, চিংড়ি ইত্যাদি
ঘ) ইদুঁর, কেঁচো, পিপড়া প্রভৃতি।

৬। পীট মাটিতে জৈব পদার্থ বিয়োজনে কারা অংশগ্রহণ করে?
ক) নেমাটোড
খ) কেচোঁ
গ) প্রোটোজোয়া
ঘ) রোটিফারস

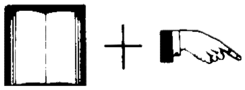

পাঠ ৪.৪ মৃত্তিকা অণুজীব

এ পাঠ শেষে আপনি –

- মৃত্তিকায় বসবাসকারী অণুজীবসমূহের নাম ও পরিচিতি বলতে পারবেন।
- অণুজীবসমূহের বৈশিষ্ট্য ও কার্যবলীর বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে অণুজীবের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

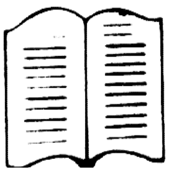

অণুজীবের শ্রেণিকরণ

মৃত্তিকা অণুজীব

ব্যাকটেরিয়া | একটিনোমাইসিটিস | শৈবাল বা শেওলা | ছত্রাক

ব্যাকটেরিয়া

ব্যাকটেরিয়া, মাটি, পানি, বায়ু এবং জীবদেহের ভিতর ও বাহির সর্বত্রই বিদ্যমান এরা এককোষী অণুজীব।

১। ব্যাকটেরিয়া এক প্রকার এককোষী ক্ষুদ্র অণুজীব।

২। কখনও খালি চোখে দেখা যায় না।

৩। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে হয়।

৪। এরা সর্বত্রই বিদ্যমান যথা- মাটি, পানি, বায়ু এবং জীবদেহের ভিতর ও বাহির।

ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্য

১। এককোষী জীবাণু।

২। দেহে এক বা একাধিক ফ্লাজেলা থাকতে পারে।

৩। দেহ লম্বারূপ ধারণ করে দ্বিখন্ডীকরণ বা বাইনারীফিসন পদ্ধতিতে বংশ বৃদ্ধি করে।

৪। আকারে ২-৫ মাইক্রন এবং ব্যতিক্রমধর্মী ০.২-৮০ মাইক্রন হয়ে থাকে।

৫। এরা পরজীবি, মৃতজীবি, বায়ুজীবি কিংবা অবায়ুজীবি হতে পারে।

ব্যাকটেরিয়ার গঠন

১। নিউক্লিয়াস সরল এবং সাইটোপ্লোজমের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকে।

২। গোল ও দন্ড হতে শুরু করে বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে। যথা ঃ গোলাকার, দন্ডাকার, পেচানো আকৃতির, কমা আকৃতির, প্রিজম আকৃতির ইত্যাদি তবে দন্ডাকৃতির সংখাই বেশি।

৩। ব্যাকটেরিয়ার দেহে যে সকল অংশ থাকে-

ক) কোষ প্রাচীর
খ) মেজোসম
গ) লিপিড দানা
ঘ) নিউক্লিয়ার দ্রব্য
ঙ) পাজমা ঝিল্লি
চ) রাইবোসম

চিত্র ১০ ঃ ব্যাকটেরিয়া

মৃত্তিকায় ব্যাকটেরিয়ার অবস্থান

মৃত্তিকার প্রতি গ্রামে ১-১০ বিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া এবং প্রতি একরে ১৮০-১৮০০ কেজি বায়োমাস থাকে।

১। মাটিতে প্রচুর ব্যাকটেরিয়া থাকে।

২। প্রতি গ্রামে ১-১০ বিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া এবং প্রতি একরে ১৮০-১৮০০ কেজি বায়োমাস থাকে।

৩। ব্যাকটেরিয়া মাটিতে বিভিন্ন কণার চারদিকে যেখানে বিশেষ করে তাদের খাবার এবং অন্যান্য অনুকূল অবস্থা পায় সেখানে বংশ বৃদ্ধি করে কলোনী সৃষ্টি করে।

৪। মাটিতে খনিজ ও মিশ্রিত জৈব কোলয়েড ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধির পক্ষে উপযুক্ত মাধ্যম।

৫। মাটিতে পরজীবি শ্রেণিভূক্ত ব্যাকটেরিয়াই বেশি থাকে এবং এরা জৈব পদার্থ বিশ্লেষণের মাধ্যমে শক্তি সংগ্রহ করে।

বিভিন্ন কারণে মাটিতে ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণে তারতম্য ঘটে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ বা উপাদান সমূহ হচ্ছে ঃ

(১) জৈব পদার্থ

(২) আর্দ্রতা

(৩) গ্রহণযোগ্য খাদ্যের পরিমাণ

(৪) বায়ু চলাচলের অবস্থা

(৫) তাপমাত্রা

(৬) অম্লত্ব ও ক্ষারকত্ব

(৭) মৃত্তিকার স্তরের অবস্থান

(৮) ঋতু পরিবর্তন, প্রভৃতি

মৃত্তিকায় ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধির উপাদান

পানি

(ক) গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য যতটুকু পানি মাটিতে থাকা প্রয়োজন ঠিক সে পরিমাণ পানি ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধির জন্য সর্বাধিক অনুকূল।

(খ) মাটিতে পানির মাত্রা অক্সিজেন সরবরাহকে প্রভাবিত করে।

(গ) ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি মাটিতে অক্সিজেন সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল।

তাপমাত্রা

(ক) ২০°-৩৭.৫° সে. তাপমাত্রায় ব্যাকটেরিয়ার কার্যক্ষমতা সবচেয়ে বেশি।

(খ) অত্যধিক তাপমাত্রায় ব্যাকটেরিয়া মরে যায়।

জৈব পদার্থ ব্যাকটেরিয়ার শক্তির উৎস হিসাবে কাজ করে। জৈব পদার্থ বেশি থাকলে ব্যাকটেরিয়াও বেশি থাকে।

জৈব পদার্থ

(ক) জৈব পদার্থ ব্যাকটেরিয়ার শক্তির উৎস হিসাবে কাজ করে।

(খ) জৈব পদার্থ বেশি থাকলে ব্যাকটেরিয়াও বেশি থাকে।

বিনিময়যোগ্য ক্যালসিয়াম ও অম্লতা

(ক) অধিক বিনিময়যোগ্য ক্যালসিয়াম ও ৬-৮ অম্লতা ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক।

(খ) কোন শ্রেণির ব্যাকটেরিয়া কত থাকবে তা নির্ভর করে মাটির অম্লতা ও বিনিময়যোগ্য ক্যালসিয়ামের ওপর।

(গ) কোন কোন ব্যাকটেরিয়া অধিক অম্ল (পিএইচ ৩.০ এর কম) ও অধিক ক্ষার (পিএইচ ৯.০ এর বেশি) অবস্থাতেও সক্রিয় থাকে।

ব্যাকটেরিয়ার কার্যাবলী

ব্যাকটেরিয়া বায়ুমন্ডলীয় নাইট্রোজেন সংযোজনে অন্যতম ভূমিকা রাখে। নাইট্রোজেন সংযোজন করে ভূমির উর্বরতা বাড়ায়।

১। ব্যাকটেরিয়া জৈব পদার্থ বিয়োজন বা বিশ্লেষণে সর্বাধিক সহায়ক।

২। ব্যাকটেরিয়া বায়ুমন্ডলীয় নাইট্রোজেন সংযোজনে অন্যতম ভূমিকা রাখে। নাইট্রোজেন সংযোজন করে ভূমির উর্বরতা বাড়ায়।

৩। ব্যাকটেরিয়া তিনটি বিশেষ ধরণের জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া মাটিতে সংঘটিত করে।

ক) নাইট্রিফিকেশন প্রক্রিয়ায় এমোনিয়াম (NH_4^+) কে জারিত করে নাইট্রেট (NO_3^-) উৎপন্ন করে।

খ) সালফারকে জারিত করে সালফেটে (SO_4^{2-}) রূপান্তরিত করে।

গ) নাইট্রোজেন ফিক্সেশন বা বায়ুস্থিত নিষ্ক্রিয় নাইট্রোজেনকে শিমজাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ের নডিউলে (Nodule) জমা করে। যা উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং মৃত্তিকায় নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ায়।

ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিভাগ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ভিত্তিতে ব্যাকটেরিয়ার ৭-৮ প্রকার শ্রেণিবিভাগ করা সম্ভব। এগুলো হচ্ছে-

১। ট্যাক্সোনোমিক শ্রেণিবিভাগ

২। তাপমাত্রাভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

৩। দেহে ফ্লাজেলার অবস্থান ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

৪। আকার আকৃতি ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ, যথা ঃ

(ক) দন্ডাকার

(খ) গোলাকার

(গ) পেচানো

(ঘ) কমাকৃতি ও

(ঙ) প্রিজম

৫। পুষ্টিভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ, যথা ঃ

(ক) স্বভোজী ও

(খ) পরভোজী।

৬। অক্সিজেনের উপস্থিতিভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ, যথা ঃ

(ক) বায়ুজীবি ও

(খ) অবায়ুজীবি।

চিত্র ১১ ঃ বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া

একটিনোমাইসিটিসের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য

১। ব্যাকটেরিয়ার মত এককোষী উদ্ভিদ।

২। ব্যাকটেরিয়ার মতই এদের ব্যাস।

৩। এদের যখন শাখাযুক্ত মাইসেলিয়া থাকে তখন ছত্রাকের মত দেখায় এবং যখন মাইসেলিয়া ভেঙ্গে যায় তখন ব্যাকটেরিয়ার মত দেখায় কিন্তু উপরটা মোমের মত মসৃণ তাই সহজে ভিজে না।

৪। এদের দেহকোষ সুতোরমত এবং অসংখ্য শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট।

৫। রেণুস্থলী ছত্রাকের মতই উৎপন্ন হয়।

৬। এরা ভিজা ও নিরপেক্ষ (পিএইচ ৬.০-৭.৫) মৃত্তিকায়ও বেশ বাড়তে পারে।

৭। একটিনোমাইসিটিস থেকে এন্টিবায়োটিক উৎপন্ন হয় এবং সবচেয়ে পরিচিত এন্টিবায়োটিকগুলো হচ্ছে-স্ট্রেপটোমাইসিন, টেরামাইসিন, নিয়োমাইসিন প্রভৃতি।

একটিনোমাইসিটিস থেকে এন্টিবায়োটিক উৎপন্ন হয় এবং সবচেয়ে পরিচিত এন্টিবায়োটিক গুলো হচ্ছে-স্ট্রেপটোমাইসিন, টেরামাইসিন, নিয়োমাইসিন প্রভৃতি।

যে সকল অনুকূল অবস্থা একটিনোমাইসিটিসের কার্যাবলীর সহায়ক এগুলো হচ্ছে -

(১) অধিক আর্দ্র, সুনিষ্কাশিত ও সুষ্ঠু বায়ু চলাচল সম্পন্ন মৃত্তিকা

(২) যথেষ্ট জৈব পদার্থ

(৩) মাটির অম্লমান বা পিএইচ ৬.০-৭.৫

(৪) উষ্ণ আবহাওয়া

একটিনোমাইসিটিসের কার্যাবলী

> একটিনোমাইসিটিস জৈব পদার্থ উচ্চমাত্রায় বিয়োজন ঘটায় যেমন কম্পোস্ট, খামারজাত সার ইত্যাদি। এত অধিক তাপমাত্রায় অন্যান্য অণুজীবের কার্যাবলী ব্যহত হয়।

১। একটিনোমাইসিটিস জৈব পদার্থ উচ্চমাত্রায় বিয়োজন ঘটায় যেমন কম্পোস্ট, খামারজাত সার ইত্যাদি। এত অধিক তাপমাত্রায় অন্যান্য অণুজীবের কার্যাবলী ব্যহত হয়।

২। এরা ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের সংখ্যা ও কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে।

৩। হিউমাস উৎপাদনে সাহায্য ও সহায়তা দেয়।

৪। যে সব যৌগ ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক দ্বারা ভালভাবে পচতে বা বিয়োজিত হতে পারে না যেমন আমিষ, লিগনিন, কাইটিন, ফেনল প্রভৃতি বিয়োজনে এরা গুরুত্বপ র্ণ ভূমিকা রাখে।

৫। অতিরিক্ত অম্ল (পিএইচ ৫.০- এর কম) মৃত্তিকায় এদের কার্যাবলী থেমে থাকে।

৬। সদ্য কর্ষিত মৃত্তিকা থেকে যে বিশেষ গন্ধ বের হয় তার কারণ সাধারণত মোল্ড বা একটিনোমাইসিটিস।

৭। এরাই মাটিতে জৈব পদার্থে অবস্থিত খাদ্য গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় রূপান্তর করে।

শৈবাল বা শেওলার বৈশিষ্ট্য

১। এরা অতি ক্ষুদ্র স তোর মত এককোষী উদ্ভিদ।

২। ভূত্বকের কাছাকাছি অর্থাৎ মৃত্তিকার উপরিভাগের ১৫ সে.মি. এর মধ্যে বসবাস করে।

> শেওলার দেহে ক্লোরোফিল আছে ফলে সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের খাদ্য নিজেই উৎপাদন করতে পারে। তবে কিছু কিছু প্রজাতির শৈবালে ক্লোরোফিল থাকে না।

৩। এদের দেহে ক্লোরোফিল আছে ফলে সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের খাদ্য নিজেই উৎপাদন করতে পারে। তবে কিছু কিছু প্রজাতির শৈবালে ক্লোরোফিল থাকে না।

৪। নাইট্রেট ও এ জাতীয় যৌগিক পদার্থ এরা মাটি থেকে গ্রহণ করে এবং বায়ু বা মৃত্তিকাস্থিত বায়ুর কার্বন-ডাই-অক্সাইড হতে কার্বন গ্রহণ করে।

৫। সূর্যের আলো পেলে তা থেকেই শক্তি সংগ্রহ করে। আবার মাটির বেশ গভীরে থাকলে জৈব পদার্থ বিয়োজিত করে শক্তি পায়।

৬। ভিজা মাটি ও আর্দ্র আবহাওয়া এদের বসবাসের জন্য উত্তম। তবে রেণু (স্পোর) আকারে পানি ব্যতিরেকে অনেকদিন থাকতে পারে।

৭। মৃত্তিকায় শৈবালের ৬০ প্রকার প্রজাতি বিদ্যমান।

৮। ০-১৫ সেমি উপরিস্থরের প্রতি বর্গমিটার মৃত্তিকায় ১০-১০০ লক্ষ শৈবাল দেখা যায়।

> বায়ু থেকে মুক্ত নাইট্রোজেন নিয়ে এরা নিজেদের শরীর গঠনের কাজে লাগায় যা নাইট্রোজেন বন্ধন বা নাইট্রোজেন ফিক্সেশন প্রক্রিয়া বলা হয়।

৯। এরা নিরপেক্ষ মৃত্তিকা বিশেষ করে ৭-৮ পিএইচ মান সম্পন্ন জমিতে থাকতে পছন্দ করে যদিও সীমিত সংখ্যক অম্ল মাটিতেও দেখা যায়।

১০। বায়ু থেকে মুক্ত নাইট্রোজেন নিয়ে এরা নিজেদের শরীর গঠনের কাজে লাগায় যাকে নাইট্রোজেন বন্ধন বা নাইট্রোজেন ফিক্সেশন প্রক্রিয়া বলা হয়।

শ্রেণিবিভাগ ঃ

মৃত্তিকায় তিন প্রকার শৈবাল পাওয়া যায়, যথাঃ

(১) নীলাভ সবুজ,

(২) সবুজ বা ঘাস সবুজ ও

(৩) ডায়াটম

নীলাভ সবুজ শৈবালের (Blue Green Algae) গুরুত্ব

১। এদেশের মাটিতে এরা প্রতি হেক্টরে ৩০ কেজি নাইট্রোজেন যোগ করে।

২। এরা মাটিতে ৪.০-২৪ টন/হেঃ জৈব পদার্থ যোগ করে।

৩। রাসায়নিক সারের সাথে মিশিয়ে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।

চিত্র ১২ ঃ নীলাভ সবুজ শৈবাল

৪। পেস্টিসাইড প্রয়োগ কিংবা অন্যান্য রাসায়নিক সার প্রয়োগে এদের উপর তেমন প্রভাব ফেলে না।

৫। যে কোন মৃত্তিকায় প্রয়োগ সম্ভব। ইহা মৃত্তিকার ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাগুণের উন্নতি ঘটায়।

৬। অজৈব দ্রব্যকে জৈব দ্রব্যে পরিণত করতে সহায়তা দান করে।

৭। উৎপাদন খরচ কম। এদের ব্যবহারে ফলন কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

৮। মৃত্তিকার সংযুক্তি ও বুনটের উন্নতি ঘটায়।

এ নীলাভ সবুজ শৈবাল জলাভূমিতে ধানগাছের খুব সহায়ক। এরা কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ ও অক্সিজেন ত্যাগ করে যা কার্বোহাইড্রেট উৎপাদনের কাজে লাগে। এদের দেহ থেকে বেরিয়ে আসা অক্সিজেন ধান গাছ গ্রহণ করে। মৃত্যুর পর জমিতে পর্যাপ্ত নাইট্রোজেন ও জৈব পদার্থ সরবরাহ করে।

৯। ভূমিক্ষয়রোধ করে।

১০। কার্বন-ডাই-অক্সাইড বিযুক্তির ফলে মাটির ক্ষারকত্ব কমায়।

১১। শুকনো অবস্থায় বহু বৎসর টিকিয়ে রাখা ও গুণাগুণ রক্ষা করা সম্ভব।

১২। ব্যবহারে ফসলের ফলন বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে।

১৩। এ নীলাভ সবুজ শৈবাল জলাভূমিতে ধানগাছের খুব সহায়ক। এরা কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ ও অক্সিজেন ত্যাগ করে যা কার্বোহাইড্রেট উৎপাদনের কাজে লাগে। এদের দেহ থেকে বেরিয়ে আসা অক্সিজেন ধান গাছ গ্রহণ করে। মৃত্যুর পর জমিতে পর্যাপ্ত নাইট্রোজেন ও জৈব পদার্থ সরবরাহ করে।

১৪। মৃত্তিকার জীবনকাল সারাক্ষণ সজিব রাখে।

নীলাভ সবুজ শৈবালের জেনাস ও স্পেসিস

নীলাভ সবুজ শৈবালের অধীনে ১৫০টি জেনাস ও ১৫০০ স্পসিস বা প্রজাতি রয়েছে। এদেশের মৃত্তিকায় নিলিখিত নীলাভ সবুজ শৈবাল দেখা যায় ঃ

(১) এনাবেনা	(৪) পে- কটোনেমা	(৭) টলিপোথ্রিক্স ও
(২) নস্টক	(৫) ক্যালোথ্রিক্স	(৮) ফোরমিডিয়াম
(৩) সাইটোনেমা	(৬) এ্যালুমিয়া	

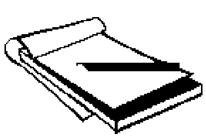

***অনুশীলন (Activity) ঃ** ফসলের ফলন ও মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধিতে নীলাভ সবুজ শেওলার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।*

ছত্রাক

মৃত্তিকায় অবস্থানরত অণুজীবের মধ্যে ছত্রাকের পরিমাণ অনেক বেশি। এক গ্রাম মাটিতে ৮ হাজার থেকে ১০ লক্ষ পর্যন্ড় ছত্রাক থাকতে পারে।

মৃত্তিকায় অবস্থানরত অণুজীবের মধ্যে ছত্রাকের পরিমাণ অনেক বেশি। এক গ্রাম মাটিতে ৮ হাজার থেকে ১০ লক্ষ পর্যন্ত ছত্রাক থাকতে পারে। একর প্রতি ০-১৫ সে.মি. মৃত্তিকায় ৫০০-৭৫০ কেজি ছত্রাক থাকে। ফসল ও চাষাবাদের জমিতে এদের সংখ্যা বেশি থাকে। মাটিতে ১৭০ বর্গের অন্ত র্গত ৬৯০টি ছত্রাক প্রজাতি রয়েছে। ছত্রাক মূল, কান্ড, পাতাবিহীন নিম্ন শ্রেণির উদ্ভিদ। অঙ্গজ অবস্থায় এরা দেখতে সূতোর মত। সূতোর মত ছত্রাক আকারে একটু বড় হতে পারে এবং দেহে শাখা প্রশাখাও বের হতে পারে আবার নাও পারে। এরা বহুকোষী। এদের চলন শক্তি নেই। যৌন ও অযৌন পদ্ধতিতে প্রজনন ঘটায় বিশেষ করে রেণু বা স্পোরের মাধ্যমে বংশবিস্তার হয়।

মাটিতে তিন প্রকার ছত্রাক রয়েছে, যথা ঃ ইস্ট, ছাতা (মোল্ড) এবং ব্যাঙের ছাতা। এরা অম্ল, নিরপেক্ষ ও ক্ষার মাটিতে অর্থাৎ প্রায় সব মাটিতে বসবাস করতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অম্ল মাটিতেই এরা অধিক হারে থাকে। চুন প্রয়োগে সংখ্যা হ্রাস পায়।

ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য

১। এদের দেহে ক্লোরোফিল নেই।

২। এরা কার্বনের জন্য জৈব পদার্থের ওপর নির্ভর করে। ফলে জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ মাটিতে অধিক পরিমাণ থাকে।

৩। এরা মৃতজীবী, মিথোজীবী বা পরজীবী।

৪। অধিক অম্ল মাটিতে বেঁচে থাকতে এদের অসুবিধে হয় না।

৫। জলাশয় বা জলাবদ্ধ এলাকায় এরা টিকে থাকতে পারেনা।

৬। বায়ুজীবী বলে উপরের স্তরে অধিক ও নিম্ন স্তরে কম থাকে।

৭। দেহ সূক্ষ সূতোর মত দেখা যায়।

৮। শাখা প্রশাখা থাকতে পারে কিংবা নাও পারে।

৯। কোন কোন প্রজাতি বীজ রেণু ধারণ করে যা দেখতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়।

চিত্র ১৩ ঃ বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক

ছত্রাকের কার্যাবলী

কতকগুলো ছত্রাক (যেমন মাইকোরাইজা) গাছের মূলে মিথোজীবী রূপে অবস্থান করে এবং গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান বিশেষ করে ফসফরাস গ্রহণে সাহায্য করে।

১। কতকগুলো ছত্রাক (যেমন মাইকোরাইজা) গাছের ম লে মিথোজীবী রূপে অবস্থান করে এবং গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান বিশেষ করে ফসফরাস গ্রহণে সাহায্য করে।

২। এরা কতকগুলো স্থায়ী জৈব পদার্থ যথা ঃ সেলুলোজ, লিগনিন ও গাম, এবং সহজে বিয়োজিত জৈব পদার্থ যথা ঃ চিনি, স্টার্চ ও প্রোটিন বিয়োজনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

৩। এসিড ও পিট মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের বিয়োজন ঘটায়।

৪। জৈব পদার্থ থেকে হিউমাস উৎপাদনে সাহায্য করে।

৫। মৃতদেহ থেকে মাটিতে জৈব পদার্থ যোগ হয়।

৬। কোন কোন ছত্রাক (পরজীবী) ফসলের রোগ ছড়িয়ে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে।

৭। অনেক প্রজাতির ছত্রাক জৈব পদার্থকে ভেঙ্গে এমোনিয়ামে পরিবর্তন করে।

৮। ব্যাঙের ছাতা (মাশরুম) ছত্রাক না থাকলে অরণ্য মাটির জৈব পদার্থ মোটেই বিয়োজিত হতো না। মাশরুম বা ব্যাঙের ছাতা পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে বিবেচিত।

৯। ছত্রাক মৃত্তিকা কার্বন ও নাইট্রোজেনের অধিকাংশ নিজেদের শরীর গঠনের কাজে লাগায়।

মাইকোরাইজা

মাইকোরাইজার অর্থ ছত্রাকমূল। ছত্রাকের মাইসোলিয়াম ও কতকগুলো সজীব উদ্ভিদের শিকড়ের ঘনিষ্ঠ সহাবস্থানকে মাইকোরাইজা বলে।

মাইকোরাইজার অর্থ ছত্রাকম ল। ছত্রাকের মাইসোলিয়াম ও কতকগুলো সজীব উদ্ভিদের শিকড়ের ঘনিষ্ঠ সহাবস্থানকে মাইকোরাইজা বলে। এ সহাবস্থান মিথোজৈবিক বা সিমবায়োটিক। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বনাঞ্চালের কিছু গাছে এ ধরনের সর্ম্পক প্রথম দেখা যায়। আধুনিক গবেষণায় ফলে বিভিন্ন মৃত্তিকায় মাইকোরাইজার উপস্থিতি ও উপযোগিতা নির্দিষ্টরূপে জানা গেছে।
ছত্রাকের সূতাকৃতি হাইফা ও উদ্ভিদ শিকড়ের কোষের মধ্যে সর্ম্পকের ওপর ভিত্তি করে এদেরকে দু'টি শ্রেণিতে ভাগ কার যায় -

১। **একটোট্রফিক বা বহিঃমাইকোরাইজা -** শিকড়ের কোষের চারদিকে অর্থাৎ অন্ন কোষের ফাঁকে প্রবেশ করলে তাকে বহিঃমাইকোরাইজা বলে।

চিত্র ১৪ ঃ বহিঃমাইকোরাইজা

২। **এন্ডোট্রফিক বা অন্ত ঃ মাইকোরাইজা -** এরা উদ্ভিদের মূলের কোষের অভ্যন্তরে (এপিডার্মির্স ও করটেক্স, প্রবেশ করে। ছত্রাক গাছের শিকড়ে প্রবেশ করার ফলে বিশেষ এনজাইম নিঃসৃত হয়।

চিত্র ১৫ ঃ অন্তঃমাইকোরাইজা

মাইকোরাইজার কার্যাবলী

১। মূলকে রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

২। অন্ত ঃ মাইকোরাইজা মরে গেলে সরাসরি উদ্ভিদের পুষ্টি যোগায়।

৩। বহিঃমাইকোরাইজা মাটিতে জৈব পদার্থ যোগায়।

> মাইকোরাইজা উদ্ভিদ শিকড়ের পুষ্টি পরিশোষণ এলাকা বাড়ায় ফলে ফসফরাস শোষণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

৪। মাইকোরাইজা উদ্ভিদ শিকড়ের পুষ্টি পরিশোষণ এলাকা বাড়ায় ফলে ফসফরাস শোষণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

৫। শিমজাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ে গুটি (নডিউল) উৎপাদন এবং নাইট্রোজেন সংযোজনে সাহায্য করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। তাপমাত্রার কোন সীমায় ব্যাকটেরিয়ার কার্যক্ষমতা সর্বোত্তম?

ক) ১০.০ - ১৫.০$^{\circ}$ সে.
খ) ২৫.৫ - ৩০.৫ সে.
গ) ৩০.০ - ৪০.০$^{\circ}$ সে.
ঘ) ২০.০ - ৩৭.৫$^{\circ}$ সে.

২। নীলাভ সবুজ শেওলা এদেশের মাটিতে কী পরিমাণ নাইট্রোজেন যোগ করে?

ক) ১০ কেজি/হেঃ
খ) ২০ কেজি/হেঃ
গ) ৩০ কেজি/হেঃ
ঘ) ৪০ কেজি/হেঃ

৩। ছত্রাক উদ্ভিদ কী ধরনের?
ক) ডালাপালা আছে
খ) শাখা প্রশাখায় সমৃদ্ধ
গ) মূল, কান্ড পতাবিহীন নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ
ঘ) মূল, কান্ড, পাতা সমৃদ্ধ উদ্ভিদ বিশেষ

৪। একটিনোমাইসিটিস এর সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য উত্তম পিএইচ মান কত?
ক) ৫.৫-৬.০
খ) ৬.০-৭.৫
গ) ৭.০-৮.০
ঘ) ৮.০-৯.০

৫। মাইকোরাইজা বিশেষতঃ উদ্ভিদের কোন অপরিহার্য পুষ্টি উপাদানে সহায়তা করে?
ক) নাইট্রোজেন
খ) ফসফরাস
গ) পটাশিয়াম
ঘ) ক্যালসিয়াম

পাঠ ৪.৫ মৃত্তিকা অণুজৈবিক প্রক্রিয়া

এ পাঠ শেষে আপনি –

- মৃত্তিকায় অণুজৈবিক প্রক্রিয়ার বর্ণনা করতে পারবেন।
- জৈব পদার্থের বিয়োজন প্রক্রিয়া ও উৎপাদিত পদার্থসমূহের নামে তালিকা তৈরি করতে পারবেন।
- মৃত্তিকা অণুজৈবিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানগুলোর নাম লিখতে পারবেন।
- মিনারেলাইজেশন, ইম্মোবিলাইজেশন, অ্যামিনাইজেশন, এমোনিফিকেশন নাইট্রিফিকেশন, ডিনাইট্রিফিকেশন প্রভৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মৃত্তিকায় অসংখ্য অণুজীব রয়েছে তা আমরা পূর্ববর্তী পাঠে জেনেছি। এসব অণুজীব দ্বারা নানা রকম অণুজৈবিক ক্রিয়া নিয়ত চলতে থাকে। এসব অণুজৈবিক ক্রিয়া দ্বারা মৃত্তিকার গঠন উন্নত হয় এবং উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। মৃত্তিকায় সংঘটিত বিভিন্ন অণুজৈবিক প্রক্রিয়া দ্বারা উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান সহজলভ্য আকারে আসে। ফলে উদ্ভিদ তা সহজে মূলের মাধ্যমে গ্রহণ করে পুষ্টিলাভ করে।

মৃত্তিকায় সংঘটিত বিভিন্ন অণুজৈবিক প্রক্রিয়া

১। **জৈব পদার্থের বিশ্লেষণ ঃ** মৃত্তিকাস্ত জীবাণু মাটিতে যেসব কাজ করে তার মধ্যে জৈব পদার্থের বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ। এ বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে সকল খাদ্য উপাদান জটিল জৈব যৌগরূপে উপস্থিত থাকে, জীবাণুরা তাদের গাছের পক্ষে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় রূপান্তরিত করে।

২। **মাটিতে জীবাণুর সাহায্যে কিছু অজৈব খাদ্যের রূপান্তর ঃ** মৃত্তিকাস্ত জীবাণুরা মাটিতে জারণ পদ্ধতি দ্বারা এমোনিয়াম আয়ন থেকে নাইট্রেট আয়নে এবং বিশ্লেষিত জৈব পদার্থের সালফারকে সালফেট আয়নে রূপান্তরিত করে। এ জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিভিন্ন এনজাইমের দ্বারা সংগঠিত হয়ে থাকে। এছাড়া অন্য কোন খনিজ দ্রব্যও জীবাণুর দ্বারা রূপান্তরিত হয়। এদের মধ্যে আয়রন (Fe) ও ম্যাঙ্গানিজ (Mn) উল্লেখ্যযোগ্য। উন্নত বায়ু ও পানি চলাচল সম্পন্ন জমিতে স্বজীবী ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা আয়রন ও ম্যাঙ্গানিজ জারিত হয়ে উচ্চ যোজ্যতা প্রাপ্ত হয়। এ জারিত অবস্থায় মাঝারি pH এর মাটিতে এদের দ্রাব্যতা অনেক কমে যায়। এজন্যই অম্ল মাটিতে জলীয় দ্রবণে ম্যাঙ্গানিজ ও আয়রনের পরিমাণ অস্বাভাবিক রকমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। কিন্তু জীবাণুদের দ্বারা এ জারণ পদ্ধতি যদি সংঘটিত না হত তাহলে অধিকাংশ অম্ল মাটিতে আয়রন ও ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ এত অস্বাভাবিক রকমে বেড়ে যেত যে গাছের পক্ষে তা বিষত ল্য হয়ে উঠত।

> মৃত্তিকাস্ত জীবাণুরা মাটিতে জারণ পদ্ধতি দ্বারা এমোনিয়াম আয়ন থেকে নাইট্রেট আয়নে এবং বিশ্লেষিত জৈব পদার্থের সালফারকে সালফেট আয়নে রূপান্তরিত করে।

৩। **নাইট্রোজেন সংযোজন (Nitrogen Fixation) ঃ** বাতাসের মধ্যে যে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন মৌল নিষ্ক্রিয় গ্যাস অবস্থায় (N_2) থাকে সে নাইট্রোজেন কিছু কিছু জীবাণু গ্রহণ করতে পারে কিন্তু গাছ সরাসরি পারে না। ঐ জীবাণুগুলো মাটিতে যখন মারা যায় তখন জৈব বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐ নাইট্রোজেন গাছ গ্রহণ করতে পারে। সাধারণতঃ দু'ধরনের ব্যাকটেরিয়া বাতাস থেকে নিজেদের শরীরে নাইট্রোজেন আহরণ করতে সমর্থ হয়। প্রথমতঃ শিমজাতীয় গাছের শিকড়ে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করে অর্বুদ বা নড্যুল সৃষ্টি করে। এদের অনেক সময় অর্বুদ জীবাণুও বলা হয়। এই ব্যাকটেরিয়া বাতাসের নাইট্রোজেন আহরণে সমর্থ। এরা পারস্পরিক বিনিময় সম্পর্ক সৃষ্টি করে গাছের শিকড়ে অবস্থান করে। গাছ কার্বোহাইড্রেট দিয়ে ব্যাকটেরিয়াকে শক্তি যোগায়, বিনিময়ে ব্যাকটেরিয়ারা বাতাস থেকে গৃহিত নাইট্রোজেনকে গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় সরবরাহ করে। এ ধরনের সম্পর্ককে সিমবায়োটিক সম্পর্ক বলে এবং এ ঘটনাকে সিমবায়োসিস বলে। দ্বিতীয়তঃ মাটিতে স্বাধীনভাবে অর্থাৎ গাছের সঙ্গে কোনরকম বিনিময় সম্পর্ক সৃষ্টি না করে বসবাস করে এমন এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া আছে

> গাছ কার্বোহাইড্রেট দিয়ে ব্যাকটেরিয়াকে শক্তি যোগায়, বিনিময়ে ব্যাকটেরিয়ারা বাতাস থেকে গৃহিত নাইট্রোজেনকে গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় সরবরাহ করে। এ ধরনের সম্পর্ককে সিমবায়োটিক সম্পর্ক বলে এবং এ ঘটনাকে সিমবায়োসিস বলে।

যারা বাতাসের নিষ্ক্রিয় নাইট্রোজেনকে নিজেদের শরীরে গ্রহণ করতে সমর্থ। মাটির জৈব পদার্থকে এরা শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহার করে। পরে যখন এই জীবাণুগুলো মারা যায় তখন এ নাইট্রোজেনের কিছু অংশ গাছের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়। প্রথমোক্ত বায়ুমন্ডলী নাইট্রোজেন সংযোজনকে সিমবায়োটিক নাইট্রোজেন সংযোজন বলে আর দ্বিতীয় পদ্ধতিকে নন-সিমবায়োটিক নাইট্রোজেন সংযোজন বলে।

Rhizobium এবং *Azotobacer* যথাক্রমে সিমবায়োটিক এবং নন-সিমবায়োটিক ব্যাকটেরিয়ার উদাহরণ।

Rhizobium এবং *Azotobacer* যথাক্রমে সিমবায়োটিক এবং নন-সিমবায়োটিক ব্যাকটেরিয়ার উদাহরণ।

জৈব পদার্থের বিয়োজন প্রক্রিয়ার ধাপ ও উৎপাদিত পদার্থ

১। জীবাণুরা প্রথমে শ্বেতসার, শর্করা ও পানিতে দ্রবণীয় প্রোটিন ধবংস করে বা বিয়োজিত করে।

২। এর পরের পর্যায়ে নানা জৈব পদার্থের মধ্যে বিয়োজনের কাজ চলে। জটিল প্রোটিন, হেমিসেলুলোজ, গাম ইত্যাদি যৌগিক পদার্থ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

৩। তৃতীয় পর্যায়ের বিয়োজনে পড়ে সেলুলোজ।

৪। তেল, চর্বি, মোম, রেজিন ও লিগনিন সবচেয়ে দেরীতে বিয়োজিত হয়। লিগনিন সহজে বিয়োজিত হতে পারে না বলেই মাটিতে হিউমাস উৎপন্ন হয়।

কোন প্রকার জৈব পদার্থ বিয়োজিত হয়ে কী কী পদার্থ উৎপন্ন হয় এগুলো এখানে দেয়া হলো ঃ

১। **কার্বন গঠিত যৌগ ঃ** কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বনেট, বাইকার্বনেট ও মৌলিক কার্বন।

২। **নাইট্রোজেন যৌগ ঃ** এমোনিয়াম, নাইট্রেট, নাইট্রাইট, ও মৌলিক নাইট্রোজেন।

৩। **সালফারের যৌগ ঃ** সালফার, হাইড্রোজেন সালফাইড, সালফাইট, সালফেট, কার্বন ডাই-সালফাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড।

৪। **ফসফরাসের যৌগ ঃ** ফসফরিক এসিড, ফসফেট, ডাই ফসফেট ও মনোফসফেট

৫। **অন্যান্য উপজাত ঃ** হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, বিভিন্ন অক্সাইড ও হাইড্রোঅক্সাইড, পানি, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি।

মৃত্তিকা অণুজৈবিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণকারী উপাদান

১। **মৃত্তিকা উপাদান**

বুনট, সংযুক্তি, অম্লমান, বায়ু চলাচল, পানি ধারণ ক্ষমতা, খাদ্যোপাদান সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অণুজীবের অবস্থান, সংখ্যা ও কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে।

বুনট, সংযুক্তি, অম্লমান, বায়ু চলাচল, পানি ধারণ ক্ষমতা, খাদ্যোপাদান সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অণুজীবের অবস্থান, সংখ্যা ও কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে। মধ্যম বুনট, উত্তম সংযুক্তি, নিরপেক্ষ বা প্রশম বিক্রিয়া সম্পন্ন মাটিতে অণুজৈবিক তৎপরতা অধিক। লবণাক্ততা, বিষাক্ত দ্রব্য, মৃত্তিকা ঘনত্ব, প্রোফাইল, আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা প্রভৃতি প্রধান মৃত্তিকা উপাদান রূপে পরিচিত।

২। **জলবায়ু উপাদান**

তাপমাত্রা, সূর্যকিরণ ও বৃষ্টিপাত শক্তিশালী জলবায়ু উপাদান। এরা মৃত্তিকা তাপ ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে। মৃত্তিকার অণুজীবের কার্যাবলী সম্পন্ন করার জন্য উত্তম তাপমাত্রা হচ্ছে ২৫-৩৫° সেঃ।

৩। **শক্তি দ্রব্য সরবরাহ**

জৈব পদার্থের প্রকৃতি, প্রকার, পরিমাণ, পচন পর্যায় প্রভৃতি অণুজীবের কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করে। মূলতঃ জৈব পদার্থ বিয়োজনের মাধ্যমে শক্তি সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে।

৪। **মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা উপাদান**

জমির চাষ, ফসলের প্রকার ও পরিচর্যা পদ্ধতি, মৃত্তিকায় অবস্থানরত অণুজীবের প্রকার, সংখ্যা ও কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে। চাষ বা ভূমি কর্ষণ মাটির বায়ু ও পানি চলাচল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অণুজৈবিক কার্য পরিচালিত করে।

মিনারেলাইজেশন (Mineralization)

মিনারেলাইজেশন প্রক্রিয়ায় জটিল জৈব যৌগ বিভিন্ন অণুজীবের ক্রিয়ায় ভেঙ্গে সরল দ্রব্যে পরিণত হয়।

যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক সার, ফসলের অবশিষ্টাংশ, সবুজ ও জৈব সার, জৈব পদার্থে অবস্থিত নাইট্রোজেন প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসে তাকেই মিনারেলাইজেশন বলে। এ প্রক্রিয়ায় জটিল জৈব যৌগ বিভিন্ন অণুজীবের ক্রিয়ায় ভেঙ্গে সরল দ্রব্যে পরিণত হয়।

ইমমোবিলাইজেশন (Immobilization)

যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী অজৈব নাইট্রোজেন যৌগ পরিবর্তিত হয়ে জৈব নাইট্রোজেনে পরিণত হয় তাকে ইমমোবিলাইজেশন বলে। এ প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকা অণুজীবসম হ সরল নাইট্রোজেন গ্রহণ করে ফলে সাময়িকভাবে মাটিতে উদ্ভিদের জন্য নাইট্রোজেনের ঘাটতি দেখা দেয়। কিন্তু এসব অণুজীব মারা গেলে গৃহীত নাইট্রোজেন জৈব পদার্থরূপে বিমুক্ত হয়।

চিত্র ১৬ ঃ নাইট্রোজেন চক্র

সাধারণতঃ মিনারেলাইজেশন, ইমমোবিলাইজেশন ও বিমুক্তকরণ মিলেই নাইট্রোজেন চক্র সম্পন্ন হয়। ছবিতে নাইট্রোজেন চক্র দেখানো হল। মূলতঃ মিনারেলাইজেশন প্রক্রিয়ার তিনটি ধাপ থাকে, যথা ঃ

(১) অ্যামিনাইজেশন (Amminization)

(২) এমোনিফিকেশন (Ammonification)

(৩) নাইট্রিফিকেশন (Nitrification)

তিনটি ধাপই জৈবিক প্রক্রিয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উপরের ছবিতে নাইট্রোজেন চক্র উপস্থাপনের মাধ্যমে মিনারেলাইজেশন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহও দেখানো হয়েছে। নিম্নে প্রক্রিয়া তিনটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

প্রোটিন থেকে এমিনো এসিডের জৈবিক রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে অ্যামিনাইজেশন বলে।

১। **অ্যামিনাইজেশন (Amminization)**

প্রোটিন থেকে এমিনো এসিডের জৈবিক রূপান্তর হওয়ার প্রক্রিয়াকে অ্যামিনাইজেশন বলে। প্রোটিনের আর্দ্র বিশে-ষণের ধাপগুলো হচ্ছে ঃ প্রোটিন $\rightarrow$ পলিপেপটাইড $\rightarrow$ পেপটাইড, এমাইনো এসিড $\rightarrow$ ইউরিয়া $\rightarrow$ এমোনিয়া।

যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এমাইনো যৌগ হতে এমোনিয়া উৎপন্ন হয় তাকে এমোনিফিকেশন বা এমোনিকরণ বলে।

২। **এমোনিফিকেশন (Ammonification)**

যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এমাইনো যৌগ হতে এমোনিয়া উৎপন্ন হয় তাকে এমোনিফিকেশন বা এমোনিকরণ বলে। অ্যামিনাইজেশন ও এমোনিফিকেশন প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও একটিনোমাইসিটিস অণুজীব প্রত্যক্ষ অংশ নেয়। ইউরিয়েজ (ঁrease) নামক এনজাইমের সাহায্যে জৈব প্রোটিন ভেঙ্গে এমোনিয়াম উৎপন্ন হয় এবং একেই এমোনিফিকেশন বলে। রাসায়নিক সমীকরণের সাহায্যেও এটা দেখানে সম্ভব।

ইউরিয়া $CO(NH_2)_2 + 2H_20 \xrightarrow{\text{ইউরিে য়জ}} (NH_4)_2\, CO_3 \rightarrow 2\, NH_4^+ + CO_3^=$

এমোনিফিকেশনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান সমূহ হচ্ছে ঃ

(১) মাটির গুণাগুণ
(২) জৈব পদার্থ
(৩) অনুজীবের প্রকৃতি
(৪) চুন প্রয়োগ
(৫) পানি নিষ্কাশন
(৬) চাষাবাদ
(৭) তাপমাত্রা
(৮) মৃত্তিকা পিএইচ বা অম্লতা ও
(৯) লবণাক্ততা

এমোনিয়া থেকে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নাইট্রেটে রূপান্ড্র ঘটার নামই নাইট্রিফিকেশন।

৩। **নাইট্রিফিকেশন (Nitrification)**

এমোনিয়ার বিশেষ অংশ ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য জীবাণুরা গ্রহণ করে, আর একটা অংশ গাছপালা শোষণ করে এবং অবশিষ্টাংশ মাটিতে থেকে যায়। এ এমোনিয়া থেকে এবার কোন কোন ব্যাকটেরিয়া নাইট্রাইট উৎপন্ন করে এবং নাইট্রাইট আবার নাইট্রেটে রূপান্তরিত হয়। এমোনিয়া থেকে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নাইট্রেটে রূপান্তর ঘটার নামই নাইট্রিফিকেশন (Nitrification)। এখানে স্বভোজী (অটোট্রফিক) ও পরভোজী (হেটারট্রফিক) ব্যাকটেরিয়া জৈবিক রূপান্তর ঘটায়। প্রথমতঃ নাইট্রোসোমোনাস (Nitrosomonas) ও নাইট্রোসোকক্কাস (Nitrosococcus) জাতীয় ব্যাকটেরিয়া এমোনিয়াকে নাইট্রাইটে পরিবর্তিত করে তারপর নাইট্রোব্যাক্টার (Nitrobacter) জাতীয় ব্যাকটেরিয়া এ নাইট্রাইট থেকে নাইট্রেট তৈরি করে। নিম্নে বিক্রিয়া দেখানো হলো ঃ

১. $2NH_3 + 80_2 = 2HN0_2 + H_20$

২. $2HN0_2 + 0_2 = 2HN0_3$

নাইট্রিফিকেশনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান সমূহ হচ্ছে ঃ

(১) মাটির অম্লমান
(২) বায়ু চলাচল
(৩) আর্দ্রতা
(৪) তাপমাত্রা
(৫) জৈব পদার্থ
(৭) লবণের ঘনত্ব
(৮) চাষাবাদ
(৯) চুন প্রয়োগ
(১০) সার/পেস্টিসাইড প্রয়োগ
(১১) কর্দম কণা ও

(৬) সি-এন অনুপাত

(১২) মৃত্তিকা স্তর বা গভীরতা

অণুজীবের ক্ষতিকর প্রভাব

১। উদ্ভিদ ও প্রাণীর রোগ সৃষ্টি করে।

২। বড় বড় গাছপালা ও চাষের ফসলের সাথে প্রতিযোগিতা করে।

৩। কোন কোন বিষাক্ত দ্রব্য উৎপাদন করে।

৪। নাইট্রোজেন বিমুক্ত করণ বা ডিনাইট্রিফিকেসনে অংশ নেয়।

মৃত্তিকাস্থিত নাইট্রোজেন যৌগকে বিজারিত করে অ্যামোনিয়া বা মৌলিক নাইট্রোজেন মুক্ত করে দেয়ার নামই নাইট্রোজেন বিমুক্তকরণ বা ডিনাইট্রিফিকেশন। কখনও এমোনিয়ারূপে ও আবার কখনও নাইট্রোজেনরূপে মুক্ত হয়ে বায়ুমন্ডলে চলে যেতে পারে।

মৃত্তিকাস্থিত নাইট্রোজেন যৌগকে বিজারিত করে অ্যামোনিয়া বা মৌলিক নাইট্রোজেন মুক্ত করে দেয়ার নামই নাইট্রোজেন বিমুক্তকরণ বা ডিনাইট্রিফিকেশন। কখনও এমোনিয়ারূপে ও আবার কখনও নাইট্রোজেনরূপে মুক্ত হয়ে বায়ুমন্ডলে চলে যেতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। জীবাণুরা কোন্গুলোকে প্রথম বিয়োজিত করে?
- ক) শ্বেতসার, শর্করা ও দ্রবণীয় প্রোটিন
- খ) জটিল প্রোটিন, গম, হেমিসেলুলোজ
- গ) সেলুলোজ
- ঘ) চর্বি, মোম, রেসিন

২। বিয়োজন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত কার্বন-গঠিত যৌগিক পদার্থ কোন্টি?
- ক) এমোনিয়া
- খ) নাইট্রাইট
- গ) সালফার
- ঘ) কার্বনেট

৩। এমোনিফিকেশন পদ্ধতিতে কী হয়?
- ক) এমোনিয়াম থেকে নাইট্রাইট
- খ) এমাইনো যৌগ থেকে এমোনিয়া
- গ) এমোনিয়াম থেকে নাইট্রেট
- ঘ) সালফার থেকে সালফেট

৪। এমোনিয়া রূপে নাইট্রোজেন মুক্ত হয়ে বায়ুমন্ডলে চলে যাওয়ার নাম কী?
- ক) নাইট্রোজেন বিমুক্তকরণ বা ডিনাইট্রিফিকেশন
- খ) এমোনিফিকেশন
- গ) নাইট্রিফিকেশন
- ঘ) ইম্মোবিলাইজেশন

৫। কোন প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকায় উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেনের সাময়িক অভাব দেখা দেয়?
- ক) নাইট্রিফিকেশন
- খ) ইম্মোবিলাইজেশন
- গ) ডিনাইট্রিফিকেশন
- ঘ) অ্যামিনাইজেশন

৬। কোন জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া বা অ্যামোনিয়াম যৌগ থেকে নাইট্রেট উৎপন্ন হয়?
- ক) এমোনিফিকেশন
- খ) অ্যামিনাইজেশন
- গ) ইম্মোবিলাইজেশন
- ঘ) নাইট্রিফিকেশন

ব্যবহারিক
পাঠ ৪.৬ শিম জাতীয় গাছের শিকড়ের নড্যুল পরীক্ষা (স্পাইড সহ)

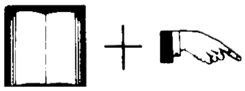

এ পাঠ শেষে আপনি –

- হ্যাংগিং ড্রপ পদ্ধতিতে শিম জাতীয় গাছের নড্যুলের গতি (Motile) বা স্থিরতা (Non-motile) পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন।
- অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার শিখতে পারবেন।
- উল্লিখিত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সাবধানতার তালিকা প্রস্তুত করতে পারবেন।

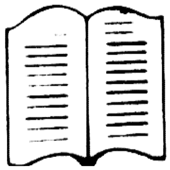

হ্যাংগিং ড্রপ বা ঝুলন্ত ফোটা পদ্ধতিতে নড্যুল (অর্বুদ) পরীক্ষা

সাধারণত মৃত্তিকায় বায়ু চলাচল সুবিধাদি, তাপমাত্রা, স র্যালোক, ক্যালসিয়াম ও পিএইচ বা অম্লমান, মৌলিক পদার্থের পরিমাণ ইত্যাদি উপাদান এ জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধিতে সহায়ক। শিমজাতীয় গাছ একর প্রতি ২৫-৫০ কেজি নাইট্রোজেন সংযোজন করে থাকে, তবে মাসকলাই ১৯ কেজি, মুগ ১৭ কেজি, মসুর ২৮ কেজি, বরশিম ২৭ কেজি, বরবটি ২৫ কেজি ও মেথি ৩০-৬০ কেজি নাইট্রোজেন একর প্রতি বাতাস থেকে মাটিতে মওজুদ করে।

> শিম জাতীয় গাছ একর প্রতি ২৫-৫০ কেজি নাইট্রোজেন সংযোজন করে থাকে, তবে মাস-কলাই ১৯ কেজি, মুগ ১৭ কেজি, মসুর ২৮ কেজি, বরসীম ২৭ কেজি, বরবটি ২৫ কেজি ও মেথি ৩০-৬০ কেজি নাইট্রোজেন একর প্রতি বাতাস থেকে মাটিতে মওজুদ করে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

(১) তাজা নড্যুল
(২) ওয়াচ গ্লাস বা পেট্রিডিশ
(৩) পরিস্কার পানি
(৪) লুপ যুক্ত বিশেষ নিড্‌ল/সুই
(৫) গ্লাস রড
(৬) হলো বা গর্তযুক্ত পাইড
(৭) কভার পিপ ও
(৮) অণুবীক্ষণ যন্ত্র

কাজের ধাপ

১। মাঠ থেকে সুস্থ ও সতেজ শিম জাতীয় গাছের নড্যুলসহ শিকড় সংগ্রহ করুন।
২। নড্যুল (অর্বুদ) নিয়ে ভালভাবে পরিস্কার পানি দিয়ে ধৌত করুন।
৩। নড্যুল সমূহ তারপর ওয়াচ গ্লাস বা পেট্রিডিশে রাখুন।
৪। কাঁচের রড বা দন্ড দিয়ে আস্তে চাপ দিয়ে ভাঙ্গুন।
৫। টিউবওয়েল/পাতিত অথবা পরিস্কার পানি দিয়ে নির্যাস বা সাসপেনসন তৈরি করুন।
৬। নড্যুলের খোসা ফেলে দিনে।
৭। এবার পরিষ্কার হলো বা গর্তযুক্ত বিশেষ পাইড ও কভার পিপ নিন।
৮। কভার পিপের মাঝখানে সুইয়ের মাথার লুপ দিয়ে এক ফোটা সাসপেনসন রাখুন।
৯। কভার পিপের চার পাশে সামান্য আঠালো দ্রব্যাদি দিন ।
১০। পাইডটির গর্তের দিকটা পরীক্ষা করে গর্তটি ঠিক কভার পিপের মাঝখানে পড়ে এরূপভাবে বসান।
১১। কভার পিপে চাপ রেখে উল্টো করুন যাতে কভারপিপ পাইডের উপরের দিকে থাকে।
১২। তারপর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কভার পিপের ভিতর ড্রপটি পর্যবেক্ষণ করুন।

চিত্র ১৭ ঃ ক- নড্যুলসহ গাছ; খ- ওয়াচ গ্লাস; গ্লাসরড; ঘ- গর্তযুক্ত পাইড

চিত্র ১৮ ঃ নড্যুল সংগ্রহকরণ

পর্যবেক্ষণ

১। ব্যাকটেরিয়ার গতি চোখে ভাসলে বুঝতে হবে জীবন্ত বা মোটাইল ব্যাকটেরিয়া।

২। ব্যাকটেরিয়ার গতি স্থির থাকলে বুঝতে হবে ননমোটাইল বা মৃত কিংবা স্থির গতিসম্পন্ন ব্যাকটেরিয়া।

ফলাফল ঃ পর্যবেক্ষণ থেকে লিখে নিন যে ব্যাকটেরিয়া মোটাইল নাকি ননমোটাইল।

সাবধানতা

১। আবশ্যই সতেজ ও ভাল গাছ বাছাই করুন যাতে শিকড়ে পর্যাপ্ত নড্যুল থাকে।

২। বৃদ্ধ গাছ আনবেন না।

৩। পরিস্কার পাইড ও কভার পিপ নিন।

৪। বড় ড্রপ বা ২-৩ বার ড্রপ দিবেন না।

৫। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহয্যে সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করুন যাতে কভার পিপ বা পাইড ভেঙ্গে না যায়।

৬। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রথমে কম ও পরে অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন ল্যান্স ব্যবহার করুন।

পরীক্ষা পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় উপকরণ, কাজের ধাপ, পর্যবেক্ষণ, ফলাফল ও সাবধানতা আপনার ব্যবহারিক খাতায় লিখে নিন। এবার আপনার টিউটরকে দেখিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নিন।

ইউনিট ৪

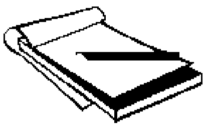

চূড়ান্ত মূল্যায়ন
সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। হিউমাস কী? এর বৈশিষ্ট্য লিখুন।

২। হিউমাসের উপাদানসমূহের তালিকা প্রস্তুত করুন।

৩। কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৪। হিউমিক এসিড, ফালভিক এসিড, হিউমিন ও এলমিন এবং হেমাটোমেলানিক এসিডের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৫। জৈব পদার্থ কাকে বলে? হিউমাস ও জৈব পদার্থের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরুন।

৬। মৃত্তিকার ভৌত ও জৈবিক গুণাবলীতে জৈব পদার্থের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

৭। ‘জৈব পদার্থ গাছপালার প্রাণকেন্দ্র’– ব্যাখ্যা দিন।

৮। মৃত্তিকা জীব কী? এদের শ্রেণিবিভাগ দেখান।

৯। মৃত্তিকা কেঁচো সমন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করুন।

১০। প্রোটোজোয়ার ওপর টীকা লিখুন।

১১। নেমাটোড ও রোটিফারসের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

১২। ব্যাকটেরিয়া সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

১৩। নীলাভ সবুজ শেওলার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

১৪। মৃত্তিকায় বিভিন্ন অণুজৈবিক প্রক্রিয়ার আলোচনা করুন।

১৫। চিত্রসহ নাইট্রোজেন চক্রের বর্ণনা দিন।

১৬। সংক্ষিপ্ত টিকা লিখুন-

(ক) মিনারেলাইজেশন,
(খ) ইম্মোবিলাইজেশন,
(গ) এমাইনিজেশন,
(ঘ) এমোনিফিকেশন,
(ঙ) নাইট্রিফিকেশন,
(চ) ডিনাইট্রিফিকেশন।

উত্তরমালা

পাঠ ৪.১

১। গ, ২। খ, ৩। ঘ, ৪। ক, ৫। খ

পাঠ ৪.২

১। ক, ২। ঘ, ৩। খ, ৪। গ, ৫। ক

পাঠ ৪.৩

১। খ, ২। গ, ৩। ঘ, ৪। খ, ৫। ঘ ৬। ঘ

পাঠ ৪.৪

১। ঘ, ২। গ, ৩। গ, ৪। খ ৫। খ

পাঠ ৪.৫

১। ক, ২। ঘ, ৩। গ, ৪। খ, ৫। ক ৬। ঘ